CALCUTTA UNIVERSITY

২৭শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

শিক্ষা

অগ্রহায়ণ
১৩৭৫

"চরিত্র গঠনই শিক্ষার আদর্শ। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন ভারতবাসীর মনে সাহস আনিয়া দেয়, শক্তি দেয় এবং বহু সদ্‌গুণ সৃষ্টি করিয়া উচ্চ আদর্শের সাধনায় তাহারা যেন ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়। অক্ষরজ্ঞান অপেক্ষা চরিত্র গঠনই অধিক মূল্যবান, পুঁথিগত বিদ্যা চরিত্রগঠনে সাহায্য করে বলিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা। এই কারণেই ভারতের জনগণের অক্ষরজ্ঞানের প্রভূত অভাবকে শোচনীয় ঘটনা জানিয়াও আমি বিচলিত হই না এবং এই অপরাধে ভারতবাসী স্বাধীনতার অযোগ্য বলিয়াও মনে করি না।"

—গান্ধীজী

শিক্ষা : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

সূচী

আলোচনা ১
যুদ্ধবাদী শিক্ষার ঘুনিয়াদ ৩
আচার্য বিনোবাভাবে
মহাজীবনের পুণ্যালোকে (জীবনী) ৫
কামাখ্যানাথ দত্ত
শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি ১৪
কালীবাদ বসু
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ১৭
শ্রীমুকুলবন্ধু রায়
শিক্ষায় ডাক্তারি ২০
শ্রীচৈতন্যচরণ কর্মকার
শিক্ষাসুধারস ২৩
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

র‍্যালফ ওয়ালডো ট্রাইন-এর
বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ
In Tune with the Infinite-এর
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
কৃত অনুবাদ

অনন্তের সুরে

মূল্য তিন টাকা মাত্র

এশিয়া পাবলিশার্স
১৫৮-বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৪

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৪০ পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৫০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩০৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৫৲ টাকা। শিক্ষকের কভারের পৃষ্ঠা ৬০৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ৪১৲, সিকি পৃষ্ঠা ২৫৲ টাকা।

৩। প্রবন্ধাদি, টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র শান্তিরঞ্জন দাস, পরিচালক, শিক্ষা, সি-৪২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কর্ম্মসু দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৭শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষা ও গান্ধী শতাব্দী

'শিক্ষা'র নববর্ষ শুরু হল। বর্ষারম্ভে আমরা 'শিক্ষা'র প্রবীন লেখকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নবীন লেখকগণের প্রতি সুগভীর প্রীতি নিবেদন জানাচ্ছি। শুভকামনা করছি 'শিক্ষা'র গ্রাহক ও অন্যান্য সকলের যাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতার ওপর শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে।

নববর্ষের শুরুতে 'শিক্ষা'র সমগ্র চিন্তা স্বভাবতই কালজয়ী মহান শিক্ষক, অতুলনীয় আচার্যের জীবন ও দর্শনের ওপর। আচরণবাদী, আচরণনিষ্ঠ না হলে শিক্ষা ও শিক্ষক শুধু শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার বোঝাই ভারী করে কিম্বা শিক্ষার্থীকেই সমাজের ওপর এক বোঝাস্বরূপ চাপিয়ে দেয়।

আদর্শ শিক্ষক মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আচার্য জনসাধারণ। নিজেকে গড়েপিটে কী করে মানুষ করতে হয় এবং মানুষের মত মানুষ হয়ে কী করে অগণনীয় মানুষের চিত্তাকে উদ্বেল করে তুলে তাঁদেরও মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয়া যায় গান্ধীজী তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। গান্ধী-শতাব্দী 'শিক্ষা'কে আজ নববর্ষারম্ভে এই দৃষ্টান্তের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

মানবেতিহাসের সবচেয়ে ক্রান্তিকারী অধ্যায়ের শতবর্ষ শুরু হল। মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষ গুরুত্বের আলোকে আজ শতবর্ষ পরে যখন আমরা পোরবন্দরের সেই সামান্য শিশু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মের তাৎপর্য অধ্যয়ন করব তখন বিস্ময়ের আর অবধি থাকবে না। মানুষের ইতিহাসে এই একশ বছরে একহাজার বছরের গতি লাভ করেছে এবং সে-গতি ধ্রুবগতি, সত্য সত্যই প্রগতি, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গতি। গতি মানে স্ফূর্তি নয়। শাশ্বতপদক্ষেপে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যে অগ্রগমন তারই যথার্থ সংজ্ঞা 'গতি'। অশান্ত, উদ্ভ্রান্ত ও অসহিষ্ণু মানুষের দ্রুতগতির নামে যে প্রগতি কথাটি চালু হয়েছে তার পরিণামে সর্বত্রই দুর্গতি, অর্থাৎ যে গতির অন্তে দুঃখ। এবম্বিধ গতি স্বভাবতঃই ক্রান্তির পরিপন্থী। ইতিহাসের শান্তম মানুষের প্রশান্তম মহাকাল মানুষের চিত্তভূমিকে যেভাবে উদ্বেল করে তুলছে অহিংসা বা প্রেমের শক্তিকে যে ব্যবহারিক

ও অব্যর্থ সামাজিক রূপ দান করেছে তার দ্বারা দিয়েই ক্ষয়িষ্ণু ও বিষাদহীন পৃথিবী চলিষ্ণু ও প্রত্যয়সিদ্ধ পথের সন্ধান পেয়েছে। পথ যদি ভুল হয় অন্তত হয়, তাহলে সে-পথে প্রথমটায় দ্রুত গতিতে চলা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত যাত্রীদল এমন চড়ায় ঠেকে যায় যে, নিজেও ভোবে, সহযাত্রীদেরও ডোবায়; অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে বা আপাত বিচারে যা ছিল দ্রুতগতি অপরিণাম বা সুপরিণামহেতু তা-ই শ্লথতর ও নিষ্ফলা হয়ে দাঁড়ায়। গতির সার্থকতা পরিণামে, দ্রুতিতে নয়। গান্ধীর পথ চিরন্তন মানবতার সুরে বাঁধা বলেই তার ফলপ্রসূতা নিশ্চিত—আরও বড় কথা—এই পথ পথের চারপাশের সবাইকে নিয়ে চলার মধ্য দিয়ে আপনি সার্থক হয়ে ওঠে। সকল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার এই শতাব্দীর গান্ধীপথ, অর্থাৎ ব্যবহারিক অহিংসার সামাজিক প্রয়োগ; এই শতাব্দীর মহত্তম শিক্ষা লক্ষ্য ও পথের, উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমান শুদ্ধি, সমান সঙ্গতি। কি ব্যক্তিজীবনে, কি সামাজিক জীবনে, আত্মবিকাশ ও সার্থক অগ্রগতির এত বড় রহস্যকথা আর আবিষ্কৃত হয়নি।

লক্ষ্য ও পথের উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমীকরণ এই নীতি যদি জনমানসে জীবনমন্ত্রের মতো গেঁথে দেয়া যায় তাহলে অন্ত সমস্ত শ্রেয়োলাভই অনায়াসসাধ্য হবে। ধ্যানের দ্বারা তন্ময়তার দ্বারা মানুষ মন্ত্রকল্প ধারণ করার শক্তি অর্জন করে। সত্য ও অহিংসা যখন প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপের মন্ত্র হয় সে জীবন ধীরে ধীরে সত্যোপলব্ধির আলোকে মহাজীবনে পরিণত হতে থাকে। গান্ধীজির জীবন লৌকিক জীবনে এই সত্যসাধন ও সিদ্ধির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত যাদের জীবনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কোন অলৌকিক গুণের অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রেম, পুরুষকার ও ভক্তির সংস্কার নিয়ে মাতার উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছিল, তিনি এই গুণাবলীকে বালকের সরল বিশ্বাস নিয়ে জ্ঞানে-অজ্ঞানে লালন করেছেন।

গান্ধীশতাব্দী উদ্‌যাপনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা হবে যদি আমরা লক্ষ লক্ষ শিশু ও তরুণের মনে এই প্রেম, সৌজন্য ও ভক্তির ঐতিহ্য মুদ্রিত করে দিতে পারি। কম-বেশী প্রায় সবশিশুই মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়েই জন্মায়, পরিবেশ বা প্রতিবেশ সেই সম্ভাবনাকে হয় বিনষ্ট করে আর না হয় বিকশিত করে। তপস্যার মত সত্যকে ধরে থাকলে কতবড় রোমাঞ্চকর জীবনের অধিকারী হওয়া যায়, কোটিকোটি মানুষের শ্রেষ্ঠসেবার কী অভাবনীয় সুযোগ পাওয়া যায়, অবনত মানুষকে টেনে তুলবার ও তাদের কল্যাণে তথা মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে আত্মবিসর্জন করে ইতিহাসে কী দিব্য গৌরব অর্জন করা যায়, গান্ধীজীবন তার এক অনন্ত দৃষ্টান্ত—অতি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। মানুষ যাঁরা হতে চান এবং মানুষ যাঁরা গড়তে চান, গান্ধীজির মহাজীবনের তুল্য ব্যবহারিক বেদ তাঁদের কাছে আর কী থাকতে পারে?

গান্ধীজীবনের এই জীবন্ত শিক্ষাও অনন্ত উদাহরণকে যদি শতাব্দীর বহুমুখী কার্যসূচির সুযোগে আমরা কচি ও কোমল মনে, আগামী-কালের নেতৃত্বের অঙ্কুরে প্রবিষ্ট করাতে পারি তবে সেটি হবে গান্ধীশতাব্দীর শ্রেষ্ঠশিক্ষা ও সার্থকতম সুফল। শিক্ষার সংগঠন, মন্ত্রপ্রয়োগ ও উন্নয়নে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের ব্রত নাকল্যের এক পরম সুযোগ এই গান্ধীশতবার্ষিকী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে সামান্য নিঃস্বার্থ ও নম্র সেবার মনোভাব নিয়ে বিবিধ ও বিচিত্র কার্যসূচির মধ্য দিয়ে আমরা যদি শিক্ষার্থীর মনের দরজায় বাপুর নামে ডাক দিই সে ডাক ব্যর্থ হবেনা, ব্যর্থ হতে পারে না।

নববর্ষে 'শিক্ষা' নিজেকেও এই সেবাব্রতে নতুন করে উৎসর্গ করছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদ

আচার্য বিনোবা ভাবে

বুনিয়াদি শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের স্থান নাই। যে আর একটি শিক্ষা আমাদের দেশে চলিতেছে তাহাতে হেডমাষ্টার, মাষ্টার ইত্যাদি থাকে। বেতন কম-বেশী হয়। আর সম্পূর্ণ উল্টা কাজ চলে। যিনি হেডমাষ্টার, যাঁর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বেশী তাঁহাকে নীচের শ্রেণীর পরিবর্তে উপরের শ্রেণীতে পড়াইতে দেওয়া হয়। আসলে যিনি সব চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, কুশলী ও বুদ্ধিমান মাষ্টার তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীতে পড়াইতে দেওয়া উচিত। কারণ সেখানে শূন্য হইতে তৈয়ার করিতে হয়, এজন্য সেখানে অধিক কুশলতা আবশ্যক।

কিরূপে শিখান হইবে

সকলেই জানেন যে, ভারতে একজন অতি বড় আচার্য ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করিতেন যে 'শিক্ষাদান' নামে কোন বস্তুই থাকিবে না। বরং গান গাওয়া হইবে, কথাবার্তা বলা হইবে, বিদ্যালাভ হইতে থাকিবে কিন্তু তাহাদের খেয়ালই থাকিবে না যে তাহারা বিদ্যালাভ করিতেছে—এরূপ ভাবে শিক্ষাদানের কাজ চলিবে। এ সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমরা কিছু শিক্ষালাভ করিতেছি, এই বোধই আমাদের থাকিবে না। অথচ কাজ করিতে করিতে বিদ্যালাভ হইয়া যাইবে। যেরূপ খেলা করিবার সময় আমাদের খেয়ালই থাকে না যে ব্যায়াম হইয়া যাইতেছে অথচ ব্যায়াম তো হইয়া যায়। কৃষক ক্ষেতে চাষের কাজ করে কিন্তু তাহার কোন খেয়াল থাকে না যে, ব্যায়াম হইতেছে অথচ ব্যায়াম হইয়া যায়।

আমাদের আশ্রমে আমি হাতে চাকী পেষাই করিতাম। একবার যার বৎসরের একটি ছেলে আমার সঙ্গে পেষাই কাজ করিতেছিল। সেই সময়ে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি বলিলেন, ইহা তো 'চাইল্ড লেবার' (শিশুদের দ্বারা শ্রমের কাজ) হইতেছে। শিশুদের দ্বারা এই প্রকার শ্রমের কাজ করান ঠিক নয়। আমি বলিলাম, বেশ। কাল আমি এই চাকীতেই বসিব—এই প্রকারেই চাকী ঘুরাইব—একবার বাম হাতে, একবার ডান হাতে, উহাতে কোন শ্রম বা ভার নিব না, অর্থাৎ কিছু পেষাই করা হইবে না তখন এইরূপে ঘুরাইতে থাকিলে তাহা আর 'চাইল্ড লেবার' হইবে না, তাহা হইবে 'এক্সারসাইজ', সেই শ্রমের দ্বারা যদি কিছু উৎপাদন হয় তবে তাহা হইবে শ্রম, আর যদি কিছু না হয় তবে তাহাকে বলা হইবে ব্যায়াম।

শ্রমবিহীন জীবনের মূল কারণ

একবার আমি একটি পুস্তক পড়িয়াছিলাম—'থ্রি মিনিটস এক্সারসাইজ'—তিন মিনিটে ব্যায়াম। কিছু করিতে হয় না। ঘরের মধ্যে একটি সতরঞ্চি বিছাইয়া ডিগবাজি খাইতে খাইতে এদিক ওদিকে যাওয়া। এরূপ বিনা শ্রমের ব্যায়াম।

আজ আমাদের সারা জীবন শ্রমবিহীন হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ দুইটি। একটি জাতি-ব্যবস্থা আর একটি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। উচ্চ জাতির লোকেরা কাজ করিবে না। তৃতীয়তঃ ইংরেজদের আগমনের পর তাহারা উচ্চ জাতির লোকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দেন। তাহারা ইংরেজী বলিতে এবং ইংরেজদের ন্যায় আচার ব্যবহার করাতেই অগ্রগতি মনে করে। 'মাদার' বলিতে তাহারা বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান বোধ করে। 'মা' বলিয়া

ভাকিতে অসহ্যান বোধ করে। এই এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা শ্রমের কাজকে হীন মনে করে। বর্ণব্যবস্থা অনুসারে উচ্চ বর্ণ ইংরেজী শিক্ষার ফলে আরও উচ্চ হইয়া গিয়াছে। উহার উচ্চতার কোন সীমা নাই। এইরূপে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অমুক কাজ নীচু আর অমুক কাজ উঁচু—এই ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই সব ভেদ ভাব ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। তবেই ভারত বাঁচিবে।

প্রশ্ন : আপনি ভারতে গ্রামদান, প্রদেশদান আন্দোলন চালাইতেছেন, নয়ী তালিমের কাজ তো আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যাহাতে নয়ী তালিম প্রবর্তিত হয় সেজন্য কোন আন্দোলনের স্থান আছে কি?

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আধার

উত্তর : আমি প্রতিনিয়ত নয়ী তালিমের কাজই করিতেছি। ১৯৫১ হইতে ১৯৬৮ পর্যন্ত ভারতব্যাপী আমার পদযাত্রা চলিয়াছে। উহাতে সর্বদা নয়ী তালিমের কাজ চলিয়াছে। শিক্ষার অহিংস বিপ্লব সাধনের কাজ চলিতেছে। ইহার পূর্বে কে পদযাত্রা করিয়া ঘুরিত? আমার পদযাত্রার পর এরূপ প্রভাব পড়িয়াছে যে বড় বড় নেতারাও নির্বাচন প্রচার কার্যের জন্য এখন পদযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পদযাত্রা কিরূপ? এই পদযাত্রা শুদ্ধ মধ্যপদলোপী সমাস পদ প্রাপ্তির জন্য যাত্রা। পদযাত্রা এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বিদ্যালয়কে সমগ্র গ্রামে ব্যাপক করিতে হইবে

বর্তমান জনগণকে শিক্ষিত না করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার বুনিয়াদই রচিত হইবে না—আর্যনায়কমজী ইহা অনুভব করেন। তিনি আমার সঙ্গে তামিলনাড়ে ঘুরিতেছিলেন। এখন তো তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। অতি দীর্ঘ শরীর, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যেও তাঁহাকে দেখা যায়। তিনি বলেন—প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতে কোটি কোটি লোকের আহার জুটে না। পরিবারে পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলেও কিছু না কিছু উপার্জন করে। মা বাপের পিঠে চড়িয়া উহাদিগকে চরাইতে লইয়া যায়। তাহা না করিলে আমরা খুব পাইব না। ৪।৬ বৎসরের ছেলে উপার্জন করে। সে অনাহারে থাকিয়া কিরূপে স্কুলে যাইবে? এইজন্য প্রথমে সকল শিশুর খাওয়াপরার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতীত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কোন আধার নাই। তিনি ইহা অনুভব করেন এবং বলেন যে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেবল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গণ্ডীর-মধ্য সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। সম্পূর্ণ গ্রামটিকেই বিদ্যালয় বলিয়া মানিতে হইবে। তারপর এক নয়ী তালিম সম্মেলনে তিনি এক প্রস্তাব পাশ করান যে, সম্পূর্ণ গ্রামকে স্কুল মানিয়া লইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়কে ব্যাপক করিয়া দিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, সম্পূর্ণ গ্রামই বুনিয়াদী শিক্ষার আধার। গ্রাম গ্রামদানে আসিলে গ্রামসভার দ্বারা প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতি ঘরের প্রতি শিশুর নিকট পৌঁছিবে।

ডাঃ জাকির হোসেন নয়ী তালিমের একজন বড় আচার্য ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা যখন গ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই উহার আসল রূপটি প্রকাশিত হইবে; নয় তো নয়। সরকার কি করিয়াছেন? কোন কোন সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাজে কি করিয়াছেন? যে এই বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিবে, হাইস্কুলে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ বুনিয়াদ রচনা করা হইয়াছে ত্রিকোণী

আর কাঠামো চতুষ্কোণী, এর উপরের কাঠামো ত্রিকোণী হউক নয়তো বুনিয়াদ চতুষ্কোণী হউক। বাপুর আশ্রমের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং শেষে উহাকেও উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ বুনিয়াদী শিক্ষার নামে ভারতে যাহা চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ অন্যায়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে চলিবে

বুনিয়াদি শিক্ষার বিচার দ্বারা অত্যন্ত ব্যাপক, প্রাথমিক্তা ব্যতীত উহার আর কোন সুযোগ নাই। গান্ধীজি এই বিচার দ্বারা দিয়াছিলেন কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিয়াছে চীন: সেখানে তাহারা হাফ-হাফ স্কুল চালাইতেছেন। তিন ঘণ্টা শ্রম আর তিন ঘণ্টা পড়াশুনা। সকল ছাত্র এই প্রকারের শিক্ষা পাইবে। জাতি, বর্ণ ও উচ্চ নীচ ভেদভাব নাই। যে স্কুলে যাইবে তাহাকেই শ্রমের কাজ করিতে হইবে। বাপু এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষায় জ্ঞান ও কর্ম সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। ভারতে আজকাল এইরূপ ব্যবস্থা নাই। [৮-৮-৬৮ তারিখে বেতিয়ার বুনিয়াদী শিক্ষকদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ]

মহাজীবনের পুণ্যালোকে

৪

(বিলাতে ছাত্রজীবন)

কানাইলাল দত্ত

ষ্টাইড জাহাজ এক শনিবার অপরাহ্নে সাউদাম্পটন্ বন্দরে নোঙর ফেলিল। গান্ধীজি বিলাতে পদার্পণ করিলেন। জাহাজে তিনি সুখই ছিলেন। তথাপি সমুদ্রজীবন তাঁহার আনন্দে কাটে নাই। আত্মীয় পরিজনের স্নেহচ্ছায়ার বাহিরে ইতিপূর্বে বস্তুতঃ তাঁহাকে কাটাইতে হয় নাই। পিতৃপ্রতীম দাদা, স্নেহশীলা মাতা, স্ত্রী ও পুত্রাদি রাখিয়া তিন বৎসরের জন্য একপ্রকার নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতে চলিয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক মনোকষ্ট তো ছিলই পরন্তু তাঁহার সাদ্ধ্য স্বভাবের জন্য তিনি জাহাজে নানা অসুবিধা ভোগ করেন। বন্ধিত্রীর ক্রোড়ে আমরা নিজেদের যেমন নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করি এমন আর কোথায়ও বোধ করি না। জাহাজ যত নিরাপদই হউক না কেন সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া যাইতে একটা অজানা দুর্বোধ্য আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উদ্বেল হইয়া পড়ে এবং মাটির স্পর্শ পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই। সুতরাং আত্মীয়-বিরহ-বেদনা সত্ত্বেও আশা করা যায়, গান্ধীজি বিলাতের মাটিতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন। অনেকদিনের কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার পর বাঞ্ছিত ভূমি বিলাতের মাটির উপর দাঁড়াইয়া গান্ধীজির চিত্ত নিশ্চয়ই অপরূপ অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিলাস বহুল ভিক্টোরিয়া হোটেলে গান্ধীজি প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানকার রীতি নীতি ধরণ ধারণ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা নাই। দুই রাত্রি এখানে থাকেন। এক পাউণ্ড টাকা ব্যয় করিয়াও তাঁহাকে প্রায় অনাহারে কাটাইতে হয়। বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন অনেককেই হইতে হয়। সম্ভবতঃ

ইহা অনুমান করিয়াই গান্ধীজি তৎকালীন লণ্ডন প্রবাসী চারজন খ্যাতিমান ভারতীয়ের নামে পরিচয় পত্র সঙ্গে করিয়া আনেন। ইহারা হইলেন—ডাঃ প্রাণজীবন মেটা, দলপৎরাম শুক্ল, দাদাভাই নৌরজী এবং রণজিৎ সিংজী।

ডাঃ মেটার সঙ্গেই গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। আত্মকথায় এই সাক্ষাৎকারের একটি অপূর্ব বিবরণ আছে। "তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।.....আমি সেলাম না করিয়াই তাঁহার রেশমের রোয়াদার টুপি নামাইয়া লইলাম এবং তাহার উপর উল্টাভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ইহাতে সেখানকার টুপির রোয়া খাড়া হইয়া গেল। .....তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দোষ যাহা হওয়ার তখন তাহা হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার ফলে আমি ভবিষ্যতে সতর্ক হইবার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।" ইহাই বোধ হয় বিলাতে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষা লাভ। ডাঃ মেটা বুঝিলেন গান্ধীজির সহবৎ শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কাহারও জিনিস ছুঁইও না পরিচয় না থাকিলে কোন প্রশ্ন করিও না; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না ইত্যাদি সচরাচর দরকার হয় এমন কয়েকটি নেতিবাচক বিষয় ডাঃ মেটা আলোচনা করিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে সাহেবদের সহিত কথা বলিতে স্যার বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি ছিল। বিলাতে কেবল মাত্র মন্ত্রি ও উপরওয়ালাকে স্যার বলা হয়। অতএব স্যার বলার ব্যাপারেও তিনি গান্ধীজিকে সাবধান করিয়া দিলেন। এমনি ভাবে বিলাতি সমাজের আদব কায়দা ও চাল চলন সম্পর্কে গান্ধীজি প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। ইহার বহু বর্ষ পরে এই গুরু শিষ্যের সম্পর্কের বদল হয়। অর্থাৎ ডাঃ মেটা গান্ধীজির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিলাতে গান্ধীজি অথৈ জলে পড়িলেন। হোটেল হইতে নিজে রান্না করিয়া খাইয়া গেলেন। নিরিবিলিতে নিজের ঘরে বসিয়া গান্ধীজী স্বীয় মনের মুখোমুখি হইলেন। গান্ধীজির তৎকালীন মানসিক অবস্থার একটি চিত্রকল্প বর্ণনা এই: দেশের কথা কেবল মনে হইত। মায়ের ভালবাসা মূর্তি ধরিয়া দেখা দিত। রাত হইলে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। ঘরের কথা মনে হইলে ঘুম আর আসে না। .....এখানকার লোক বিচিত্র, জীবনযাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র। বাড়ীতে থাকার রীতি নীতিও অজানা। কি বলিলে কি করিলে রীতি ভঙ্গ হয় সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। ইহার উপর নিরামিষ আহারের দুষ্প্রাপ্যতা তাঁহার পক্ষে বিশেষ বিড়ম্বনার কারণ হইল।

কিন্তু গান্ধীজি তো হটিবার পাত্র নন। Owen Meredith—বলিয়াছেন, Genius does what is most গান্ধীজির বেলায় এ কথা খুব খাটে। মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনেই মনটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। গান্ধীজি মনের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া কিরূপে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতেন তাহার একটু বিবরণ এই: "এখন ভাল লাগুক আর নাই লাগুক দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। তিন বৎসর এখানে পূর্ণ করিয়া যাইতেই হইবে।" বিলাতে তিন বৎসরের জীবন গান্ধীজির ব্যারিষ্টারি পড়িবার কাল। সুতরাং সময়টা তাঁহার ছাত্র জীবনের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই হেতু ইহা আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হইয়াছে। যদিও একথা আজ স্বীকৃত, যে সকল মূল আদর্শ ও বিশ্বাস ভবিষ্যতের মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার অনেকগুলি এই আইন অধ্যয়নকালের বিলাত প্রবাস জীবনে গান্ধী চরিত্রে ও চিন্তায় সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ডাঃ মেটা নানা ভাবে গান্ধীজিকে সাহায্য করেন। তাহার মতে "এদেশে আসিয়া পড়াশুনা করা অপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করার দরকার বেশী।

এই জন্ত কোন পরিবারের সহিত থাকা আবশ্যক।" যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। গান্ধীজি রীচমণ্ডে ডাঃ মেটার বন্ধুগৃহে স্থিত হইলেন। গৃহস্বামী সজ্জন মানুষ। গান্ধীজি বলেন তাঁহার ব্যবহার সদয় ছিল। আমাকে নিজের ভাইয়ের মত রাখিলেন, ইংরেজি রীতি নীতি শিখাইলেন ও ইংরেজিতে কথা বলায় অভ্যাস করাইলেন।" নিরামিষাশী হইবার জন্ত খাওয়াটা গান্ধীজির একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসিবার সময় মাতৃদেবীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন আমিষ ভোজন করিবেন না। বিলাতে নিরামিষ ভোজ্য সহজলভ্য নহে। নুন হলদা ছাড়া বিলিতি তরকারি রান্না করা সম্ভব—সে কি ভারতবাসীর মুখে সহজে রোচে? "সকালে ওট মিলের জাউ (porridge) দিয়া উহা দিয়া পেট ভরাইতাম। দুপুরে ও সন্ধ্যার প্রায় না খাইয়াই থাকিতে হইত।"

প্রায় অনাহারের এই কষ্টকর দিনগুলিতে মাংস খাইবার জন্ত গান্ধীজির উপর নিত্য নিয়মিত চাপ সৃষ্টি হইত। দেশে স্কুলে পাঠদশায় গান্ধীজি এক বিচিত্র যুক্তির ছলনায় মাংসাহারে প্রবৃত্ত হন। যুক্তিটি ছিল এই রকম: ইংরেজ শক্তিমান কারণ তাহারা মাংসাহারী। ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের তাড়াইতে শক্তি চাই। সুতরাং শক্তিমান হইবার জন্তই মাংস খাওয়া দরকার। সে সময়ে স্কুলের ছাত্র বৃন্দ কর্তৃক গীত একটি ছড়ার উল্লেখ পাই গান্ধীজির আত্মকথা গ্রন্থে:

"ইংরেজ রাজত্ব করে
দেশীকে রাখিয়া দাবিয়া
লম্বায় সে পাঁচ হাত পুরা
মাংসাহারী বলিয়া।"

বিলাত প্রবাস কালে গান্ধীজির মাংস আহারের প্রতিবন্ধকতা মাংসের প্রতি অনীহা বশে। ইচ্ছায় হোক আর ঘটনাচক্রেই হোক গান্ধীজি মাতৃদেবীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কখনই ভঙ্গ হইতে পারে না। জীবনের বিনিময়েও নহে। ইহাই গান্ধী চরিত্র। এই চরিত্রই তাঁহাকে বড় করিয়াছে। দিনের পর দিন ক্ষুধার জ্বালা, অনেক শুভানুধ্যায়ী সজ্জন মানুষের শুভবুদ্ধি প্রসূত অনুরোধ ও উপদেশ এবং সরোষ ও প্রত্যক্ষ চাপ কোনটাই গান্ধীজিকে যাহা আহারে প্রবৃত্ত করাইতে পারে নাই। এমন কি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও গান্ধীজি মাংসের সরুয়া পান করিবার জন্ত ডাক্তারের সানুনয় অনুরোধ সবিনয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন। সত্যরক্ষা যে গান্ধী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহা এমনই দুঃখ সহনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এ শক্তি ইচ্ছা মাত্র লাভ করা যায় না। দুঃসহ দুঃখের মূল্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ইহা লভ্য নহে। ইহার জন্ত নিত্য নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকা চাই। গান্ধী জীবন এই নিরন্তর প্রচেষ্টার ইতিহাস। গান্ধীজি লিখিতেছেন: "নিজেকে ঠিক রাখিবার জন্ত রোজ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম।" গান্ধী জীবনে এই প্রার্থনারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইহা যথাস্থলে আলোচিত হইবে।

বিলাতে গান্ধীজি ঘন ঘন বাসস্থান বদলাইতেন। ডাক্তার মেটা ও দলপৎরামের উপদেশে তিনি রীচমণ্ড হইতে ওয়েষ্ট কেনসিংটনে জনৈকা ভারতীয় কিরিস্তির গৃহে উঠিয়া গেলেন। এখানেও খাওয়ার অসুবিধা কিছু কমিল না। কিন্তু এই গৃহস্বামিনী গান্ধীজিকে লণ্ডনের নিরামিষ ভোজনাগারের সন্ধান দিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন একটি নিরামিষ ভোজন গৃহ পাইলেন। ইহা পাইয়া গান্ধীজির মনের অবস্থা হইল: "ছেলেরা মনের মতন জিনিস পাইলে যেমন আনন্দ পায় আমারও তাহাই হইল।.....বিলাতে আসার পর এই প্রথম পেট ভরিয়া খাইতে পারিলাম। ঈশ্বর আমার ক্ষুধা মিটাইলেন।" এইখানে নিরামিষ ভোজনের উপকারিতার উপর লিখিত অনেকগুলি

পুস্তিকা লেখেন। ইহারই তিনি বিখ্যাত হেনরি সল্টের A Plea for Vegetarianism বইখানা ক্রয় করেন হেনরি যে সল্ট তারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। কিশোর মহাত্মাই সল্টের মন বৈষম্য দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট ইহার কারণ জানিতে চান। মাতা ধরাধাধা উত্তর দেন : ইহাই হইতেছে পৃথিবীর নিয়ম। ধনী দরিদ্রের মাঝখানে ধনবান হইয়াছে এবং দরিদ্র মানুষ মজদুর করিয়া ধনহীন হইয়াছে। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই যুক্তির কোন মিল পাইলেন না—ক্রমে ক্রমে তিনি মানবতাবাদী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মানব-কল্যাণ ব্রত তাহাকে নিরামিষাশী করে। এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের লেখা পড়িয়া তিনি সরল সহজ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। ন্যাংটা বা ঢিলা ঝুলা যুক্তির প্রতীক বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হয়।

এতদিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াই মহাত্মা গান্ধী আমিষ আহার বর্জন করিয়া চলিতেছিলেন। বিশ্বাসের জোর না থাকিলে নিছক যুক্তিতর্কের কোন কাজ করা খুবই কষ্ট-সাধ্য হয়। বিলাতের পরিবেশে গান্ধীজির নিরামিষ আহার এমনই একটা কষ্টসাধ্য কাজ হইয়া পড়ে। এই রকম সময়ে সল্ট সাহেবের বইখানি তাঁহাকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিল। এই বইখানি পড়িয়া তিনি লিখিয়াছেন—"বিচার পূর্বক নিরামিষ আহার সমর্থন করিতে লাগিলাম। মায়ের দেওয়া প্রতিজ্ঞা বিশেষ আনন্দ-দায়ক হইয়া উঠিল।" যাহা তিনি ঠেকে পড়িয়া স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা এখন যুক্তির আলোকে কল্যাণকর বিবেচিত হইল। এক কথায় গান্ধীজি নিরামিষ আহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। কাজের সমর্থন হৃদয় হইতে না পাইলে তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। উহা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রাণহীন আচারে পর্যবসিত হয়। নিরামিষ আহার গান্ধীজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার জীবনধর্ম হইয়া ওঠে।

এই সকল তাগাতোলের মধ্যেও ব্যারিষ্টারি পড়িবার উদ্যোগ চলিতেছিল। ইনার টেম্পল, মিডল টেম্পল, লিঙ্কনস্ ইন এবং গ্রেজ ইন এই চারিটি দলে তৎকালে ব্যারিষ্টারি পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজি ১৮৮৮ সনের ৬ই নভেম্বর ইনার টেম্পলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু পড়াশুনা গ্রীষ্মিমত সুরু হইতে তখনও দেরি ছিল। গান্ধীজি চুপচাপ বসিয়া থাকিবার লোক নন। তিনি যে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন তাহা আমরা ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি। এই সময়ে তিনি আরও যে সব কাজে হাত দেন তাহার মধ্যে নিম্নের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। সংবাদপত্র পাঠাভ্যাস,
২। নিরামিষ ভোজন প্রসারের আয়োজন
৩। পাকা সাহেব বনিবার সাধনা।

দেশে থাকিতে গান্ধীজি খবরের কাগজ পড়েন নাই। এখনকার মত সেই সময়ে এত খবরের কাগজও ছিল না। ঐ সময়কার বিলিতি সংবাদ-পত্র তাঁহাকে একটি নূতন জগতের সন্ধান দিল। তিনি 'ডেলি নিউজ', 'ডেলি টেলিগ্রাফ', 'পেলমেল' 'গেজেট', ইত্যাদি নানাবিধ কাগজ পড়িতে লাগিলেন। উনিশ শতকের শেষ পাদের বিলীতি জীবনের সকল স্তর নূতনভাবে চিন্তার উত্তেজনায় অশান্ত ও অস্থির। ইহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। বিশ্ব আলোড়নকারী আইরিশ হোমরুল, পার্নেলিজিম, আইরিশ অপরাধ কমিশন, এমন কি বার্মী হত্যার জন্য মেক্সিকের বিচার প্রভৃতি ঘটনা যেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার, নৈরাজ্যের প্রচার, ফেবিয়ানদের চিন্তা-আন্দোলন, বিয়োগান্তিকদের প্রসার—সাহিত্য

সঙ্গীত নৃত্যকলার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারা নূতন মূল্যবোধ আনয়ন করিয়াছে। উইলিয়াম কার্পেন্টার ইহার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার My days and dreams গ্রন্থে :

The whole structure of civilization and morality is being rapidly undermined The moral aspect of property, commerce, class relations, sex relations, marriage, patriotism and so forth are shifting like dissolving views."

নূতন জীবন-পথের অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির ও মানবসত্তার প্রতি আকর্ষণ এবং অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি জীবনের সম্পূর্ণতার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে।

পেয়ারিলাল লিখিয়াছেন : The habit of newspaper reading that he had formed brought him in close touch with all these trends, conditioned his thinking on those questions in later years.

পরবর্তীকালে গান্ধীজি নিজে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সহিত কখন প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইণ্ডিয়ান ওপীনিয়ন, ভারতবর্ষের নব-জীবন, হরিজন, ইয়ং ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কাগজ আজ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'সংবাদপত্র একটি প্রচণ্ড শক্তি।' এখানেও টীপিকাল গান্ধী উক্তি : "উচ্ছৃঙ্খল লেখার স্রোত অনর্থকারী। বাহিরের শাসনে যদি উচ্ছৃঙ্খল লেখা সংযত হয় তবে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষাও অধিক বিষ হইয়া দাঁড়ায়। ভিতর হইতে যে শাসন আসে তাহাতেই রক্ষা হয়।"

বিলাতে সংবাদপত্রের সহিত গান্ধীজির যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহা চিরকাল বজায় ছিল। তিনি যখন অহোরাত্র কর্মব্যস্ত তখনও সংবাদপত্রে চোখ বুলাইবার সময় করিয়া লইতেন এবং পত্র-পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করিতে বিরত হন নাই। আর মহর্ষি বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের তো বটেই, বিশ্বেরও বলা চলে, সংবাদ পত্রের প্রধান সংবাদ ছিলেন। একা গান্ধীজি সারা জীবনে সংবাদপত্রের যতটা স্থান জুড়িয়া আছেন অন্য কোন মানুষ অতটা আছেন বলিয়া মনে হয় না।

গান্ধীজির প্রিয়তম বিষয়গুলির মধ্যে নিরামিষ আহার অন্যতম। ইতিপূর্বে জানিয়াছি ঘটনাচক্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হইলে হয়তো তিনি মাংসাশীই হইতেন। গান্ধীজীবনের প্রধান ঘটনাগুলি বিচার করিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে ঘটনার আবর্তে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন। যাহা সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়া তাহাই করিয়াছেন।

তিনি স্বেচ্ছায় ব্রতগ্রহণোদ্যত হইয়া বেশি কাজ আরম্ভ করেন নাই। নিরামিষ আহারে আগ্রহের ফলে তিনি তৎকালে বিলাতের কয়েক-জন আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সংস্পর্শে আসেন। লণ্ডের বইয়ের কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। অন্য যে সব বই তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করে তাহার মধ্যে পাই হাউয়ার্ড উইলিয়মের—দি এথিকস্ অব ডায়েট বা আহার নীতি; অ্যানা কিংসফোর্ডের উত্তম আহারের রীতি বা Perfect Way in Diet.

বিলাতে এই সময়ে যাহারা নিরামিষ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহাদের মধ্যে এডওয়ার্ড কার্পেন্টার একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে এমন অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেন। দাড়িটা সন্তর্পণে কামাইয়া ফেলার কাটাইতেন। চেহারাকে অনাবশ্যকভাবে আবৃত করিয়া রাখিবার অভ্যাস তিনি ত্যাগ করিবার পক্ষপাতি হন। কার্পেন্টারের এই মত দ্বারা

গান্ধীজি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইলেন। ঐ সময়ে অনেক ইংরেজ যুবকও এই মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিয়া শরীর শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাও যে গান্ধীজির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজি লোককল্যাণে নিরামিষ আহারের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। যে অঞ্চলে তিনি থাকিতেন সেখানেই নিরামিষ আহারের একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন। ডাঃ ওল্ডফিল্ড ইহার সভাপতি হন। সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক হইলেন যথাক্রমে গীতার বিখ্যাত অনুবাদক এডুইন আর্নল্ড এবং আমাদের গান্ধীজি। সংস্থাটি বেশি-দিন চলে নাই। কিন্তু সেই ছোট এবং অল্পকাল স্থায়ী সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গান্ধীজির হাতেখড়ি হইল। এই বিস্তারিত যে সার্থক হইয়াছিল তাহা আমরা আজ সহজেই বুঝিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র ভারত-বাসীকে তিনি একদা পরিচালনা করিয়াছেন। গান্ধীজি লিখিতেছেন: "জনসেবার জীবনে আমার হাতে লাখো লাখো টাকা পড়িলেও তাহা যোগ্য-তার ও সতর্কতার সহিত খরচ করিতে পারিয়াছি। যত আন্দোলন আমার হাত দিয়া হইয়াছে তাহাতে কখন আমি কর্জ করি নাই। বরঞ্চ দেখিয়াছি কার্যশেষে প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু জমাই আছে।" পরবর্তী কালে ডাঃ ওয়েষ্ট ও পোলক সাহেব প্রভৃতি যোগ্য সহকর্মীদের তিনি নিরামিষ ভোজনের সূত্রে ধরিয়াই পাইয়াছিলেন। অনেক অর্থও তিনি ইহার জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

বিলাতে নিরামিষ আহারের প্রসারের জন্য যতই থাকুক, আর এ বিষয়ে পুস্তকাদিই রচিত হোক সাধারণ মানুষ নিরামিষাশীদের করুণার দৃষ্টিতেই দেখিত। গান্ধীজি পাকা সাহেব সাজিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন মাংস না খাইলেও সাহেব হওয়া যায়। তাহাকে করুণা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। "ইংরেজ ভদ্রলোক" হইবার এই প্রচেষ্টায় তিনি সেরা সেরা বিলিতি পোষাক কিনিলেন। যে গান্ধীজিকে আমরা সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত দেখিয়াছি তিনি এই সময়ে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া চিমনি টুপি, সেরা সান্ধ্য পোষাক, ঘড়ির ভাল চেন, টাই ইত্যাদি সংগ্রহ করিলেন। কেশ বিন্যাসের দিকেও মনোযোগ দিলেন। পোষাক আসাক মাত্র হইলেই পুরা সভ্য হওয়া যায় না। নাচিতে জানা চাই। অতএব যোগ দিলেন নাচের স্কুলে। সুর তাল মান বোধ না থাকিলে নাচ শেখা যায় না। সুতরাং কেবা হইল বেহালা। নিযুক্ত হইলেন বেহালা শিক্ষক। হঠাৎ একদিন গান্ধীজির চৈতন্য হইল: "আমি বিদ্যার্থী। আমার যে বিদ্যার্জন সফল করা দরকার," পোষাক আসাক নাচ গান দিয়া তো তাহা হইবে না। চেতনায় একবার কোন কিছু ধরা পড়িলে তাহা কার্যে রূপান্তরিত করিতে বিলম্ব গান্ধীজির অসহ্য ছিল। সেই মুহূর্তে তিনি তথাকথিত সভ্য হইবার ঝোঁক ত্যাগ করিলেন। "সভ্য" হইবার বাসনা তাহাকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। পাকা সাহেব হইবার সাময়িক খেয়ালের ক্রিয়াকর্ম তুচ্ছ মনে হইল। দামী পোষাক মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না। গান্ধীজির উপলব্ধি হইল: আমার আচারের শুদ্ধতাই আমাকে রক্ষা করিবে।" এই আচারের শুদ্ধতার মধ্যেই গান্ধীজীবনের মহত্ত্ব নিহিত তাহা আমরা চর্মচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। শুদ্ধ আচরণের দ্বারা রক্তমাংসের দেহধারী মানুষও দেব চরিত্রের অধিকারী হইতে পারেন। গান্ধীজি কোটি কোটি মানুষের নিকট দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন—যে পথে তিনি হাটিয়া গিয়াছেন তাহার ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বহুজনে ব্যাকুল হইতেন। ইহা সামান্য কথা নহে। ইহার মূল উৎসটি শুদ্ধ আচরণের মধ্যে নিহিত, ইহা কোন ম্যাজিক নহে।

ভারতবর্ষের ভক্ত মানুষের আচরণ লইয়া অনেকে বক্রোক্তি করিয়াছেন। কিন্তু সকলের জন্য সাধারণ মানুষ এই রকম আচরণ করেন না। মহাত্মা যে কয়েকজনের জন্য অনুরূপ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে দেবত্ব বিকশিত হইয়াছিল বলিয়াই করিয়াছেন। ওই সত্যে সন্দেহ পোষণ করিলে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

এই ঘটনার পর হইতে গান্ধীজির জীবনে গভীর পরিবর্তন আসিল। তিনি পড়াশুনার মন দিলেন। আত্মকথায় লিখিতেছেন: "আমি সত্য হইবার প্রয়ত্ন ত্যাগ করিয়া কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হইয়া পড়িলাম।" কার্যক্রম স্থির করিয়া দিনচর্যায় মিনিট পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিলেন। ইহার বহুবর্ষ পরে উন্মত্ত হিংসার শ্মশানভূমি নোয়াখালিতে জীবন লাভাহে মানব অভ্যুদয়ের সাধনায় গান্ধীজি যখন নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার দিনচর্যার একটি উপাদেয় বিবরণ দিয়াছেন অধ্যাপক শ্রী নির্মল কুমার বসু। এখানেও দেখি সেই ঘণ্টা মিনিট বাঁধা। আমরা যাহারা কোন একটা কাজ হাতে আসিলেই আর পারি না বলিয়া কাতরাইতে থাকি অথবা সময় নাই বলিয়া এড়াইতে চাই তাহাদের এই দিনচর্যাটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যদেরও ইহা প্রেরণা স্বরূপ হইবে নিশ্চয়।

নোয়াখালির দিনচর্যা

ভোর ৪॥ টা—ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকর্মের মুক্ত। হাত মুখ ধোওয়া। প্রার্থনা।

প্রার্থনার পরেই কর্মারম্ভ। [নোয়াখালিতে এই সময় বাঙলা শিক্ষা করিতেন। পড়া এবং হাতের সেবা।]

৭ টা। প্রাতর্ভ্রমণ। [ভ্রমণ করিবার সময় সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সহিত আলাপ করিতেন।] ফিরিয়া আসিয়া শৌচ। শৌচাগারেই সংবাদপত্র পাঠ সারিয়া লইতেন। শৌচের পর তৈলমর্দন। একদিন অন্তর একদিন দাঁড়ি কামানো। অপর লোকে তাঁহাকে তৈল মাখাইয়া দিত। ইহার জন্য একঘণ্টা সময় লাগিত। তৈলমর্দনের পর একবার শৌচাগারে যাইতেন। অতঃপর স্নান।

স্নানের পরই খাইবার পালা। গান্ধীজি খুব ধীরে ধীরে অনেক সময় ধরিয়া খাইতেন, অন্যলোকে এই সময় তাঁহাকে প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র পড়িয়া শুনাইতেন। খাইবার পর বিশ্রাম।

বারটা নাগাদ দুপুরের কাজ আরম্ভ হইত। তিনি তখন প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রের উত্তর লিখিয়া দিতেন। ইহার পর আবার একবার বিশ্রাম এবং পেটে মাটির প্রলেপ গ্রহণ।

তিনটায় চরকা কাটিতে বসিতেন। চরকা কাটিবার সময় বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রয়োজনীয় অংশ শুনিতেন।

সূতাকাটার পর অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎকার। ৫ টায় বিকেলের শেষ আহার।

৫॥ টায় প্রার্থনা সভা বা সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার পর আধ ঘণ্টা সান্ধ্য ভ্রমণ। ফিরিয়া আসিয়াই চিঠি পত্র বা হরিজনের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বসিতেন। কখন কখন অন্তরঙ্গ লোকদের সহিত আলাপ আলোচনাও করিতেন।

৯॥ টায় শুইয়া পড়িতেন। শুইবার পূর্বে একবার পায়খানায় যাইতেন।

সেই বিলাতে ছাত্রাবস্থায় যে ঘণ্টা মিনিট বাঁধিয়া কাজ করা সুরু হইয়াছিল মৃত্যু পর্যন্ত তাহাতে ছেদ পড়ে নাই। সময় কখন অকারণে নষ্ট হয় ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এ সম্পর্কে নির্মল বাবু একটি নির্ভরযোগ্য খবর দিয়াছেন গান্ধী চরিত গ্রন্থে। অনেকা আমেরিকান মহিলা গান্ধীজির দর্শন প্রার্থী হইয়া আসেন। অপ্রয়োজনে অনেকটা সময় নষ্ট করার পর তিনি গান্ধীজির নিকট প্রশ্ন করেন "আমি আপনার ব্রত উদ্‌যাপনে কি করিয়া সাহায্য করিতে পারি?" গান্ধীজির উত্তর হইল: "আমার সময়ের প্রতি

মুহূর্ত বাঁচাইতে দিয়া" সংঘ সম্পর্কিত এই রকম অনেক কথা অনেকে লিখিয়াছেন। প্রতিটি মিনিটের সদ্ব্যবহারের দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল।

লোক সজ্ঞার ভয়—হয়তো বা খানিকটা লোভও ব্রাইটনে গান্ধীজিকে একদা মিথ্যাচরণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। একটি অকপট চিঠি লিখিয়া তিনি এই দুঃখজনক ঘটনার অবসান ঘটান। গান্ধীজির বিচারশীল মন এবং সত্যের প্রতি সদাজাগ্রত চেতনা তাঁহাকে পতনের হাত হইতে চিরকাল রক্ষা করিয়াছে। ১৯৪৬ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখের হরিজন পত্রিকায় মহাদেব দেশাইয়ের একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে গান্ধীজির একটি চমৎকার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই : "একটি জিনিস ছিল এবং তাহাই আমাকে চালাইয়া নিয়াছে। ইহা সত্যের বর্মাচ্ছাদন। ইহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং বাঁচাইয়াছে। আমার জীবনের মূল ভিত্তিই সত্য। সত্য হইতে ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা পরে উৎপন্ন হইয়াছে।" (উপেন্দ্রকুমার রায়ের অনুবাদ নারী ও সমাজিক অধিকার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

ইতিমধ্যে গান্ধীজি প্যারিস ঘুরিয়া আসিয়াছেন। উপলক্ষ ১৮৯৯ এর প্রদর্শনী। এবার ব্যারিষ্টারি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ভর্তির দুই বৎসর পরেই যে কেহ ফাইনাল পরীক্ষায় বসিতে পারিতেন। এখানে সভ্যিকারের পড়াশুনায় চাইতে খাওয়াদাওয়ার খরচ বেশি। সে জন্য এই ব্যারিষ্টারগণকে ঠাট্টা করিয়া ডোজের ব্যারিষ্টার বলিত। গান্ধীজি তাঁহার সরল ভঙ্গীতে লিখিতেছেন : "ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য দুইটি জিনিস দরকার। প্রথম টার্ম অর্থাৎ সর্ত রক্ষা করা। দ্বিতীয় আবশ্যক হইতেছে আইনের পরীক্ষা দেওয়া। প্রত্যেক টার্মে প্রায় ২৪টি করিয়া খানা হয়—তাহার মধ্যে ছয়টা অন্তত খাওয়া চাই। খানা খাওয়া মানে খাইতেই হইবে এমন নিয়ম নাই। কেবল নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দিয়া খানা খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। .....অপর দিকে পাঠ্যক্রম খুবই সহজ ছিল। রোমান আইন ও ইংলণ্ডীয় আইনে মাত্র পরীক্ষা দিতে হইত। ছোট ছোট মোট বই পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াই শতকরা ৯৫ হইতে ৯৯ জন পাশ হইত। গান্ধীজি সে কাঁকি-বাজির মধ্যে গেলেন না। তিনি আইনের মূল বই পড়িয়া পরীক্ষা দেন। ১৮৯০ সনের ৩০শে হইতে ২০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহার পরীক্ষা হয়। পরের ১২ই জানুয়ারি ফল প্রকাশিত হইল এবং বলা বাহুল্য, গান্ধীজি সহজেই পাশ করিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক ডোজে যোগদান করা হয় নাই বলিয়া ব্যারিষ্টারি পাশের সনদ পাইবার জন্য তাঁহাকে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ডোজের সর্ত পালন করিয়া ১০ই জুন তিনি ব্যারিষ্টারির সনদ পাইলেন। পরদিন ১১ই জুন হাইকোর্টে আড়াই শিলিং ফরা দিয়া নাম তালিকা-ভুক্ত করিলেন। ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত আসা, সে কার্য যখন সমাপ্ত হইয়াছে তখন আর বৃথা কালক্ষেপ কেন। পরের দিন ১২ই জুন তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

পূর্বেই আমরা জানিয়াছি বৃথা সময় নষ্ট করা গান্ধী চরিত্র বিরোধী। পরীক্ষা পাশ আর সনদ প্রাপ্তির মধ্যবর্তী প্রায় পাঁচ মাস সময়ে গান্ধীজিকে আমরা নূতন একটি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখি। প্রবন্ধকার গান্ধীজি। এই সময়ে তিনি দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ছয়টি প্রবন্ধ নিরামিষ আহার বিষয়ক ভারতীয় চিন্তা এবং তিনটি ভারত-বর্ষের উৎসবের উপর। এগুলি The Vegetarian পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দশম প্রবন্ধটির নাম The foods in India. ইহা প্রকাশিত হয় The Vegetarian Messenger পত্রিকায়। এই প্রবন্ধগুলির পাঠকের নিকট ভবিষ্যতের মহাত্মা গান্ধী দুর্নিরিক্ষ্য নন।

জীবন গঠনের সেরা তিনটি বৎসর গান্ধীজি বিলাতে কাটান। এই সময়ে অনেক বড় ইংরেজের সংস্পর্শে তিনি আসেন। শীতার সহিত তাঁহার এখানেই পরিচয় ঘটে। বিলাতের হেনরি সেভিল এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের মত লোকের "Cult of simple living—,সপ্তাহে এক পাউণ্ডের মধ্যে জীবন নির্বাহকারী আইরিশ এম পি'র মত ও বিলাস বৈভব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ অনেক আদর্শবাদী ইংরেজকে তিনি খুব নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ পান এবং এই রকম আদর্শবাদী বহুজনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভে সমর্থ হন। অনেকের সহিত এক-যোগে কাজও করিয়াছেন। সাধারণভাবে সৎ ইংরেজের সুখসাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা সরলতা গাম্ভীর্য, নিত্যাচারী সাধারণ বুদ্ধি শুচিবিধান প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাকে বিপুল ভাবে ইংরেজপ্রেমিক করিয়া তোলে। ইহা তাঁহার চিন্তা, কর্ম ও জীবন চর্চাকেও বেশ প্রভাবিত করে। বিশ বৎসর পরে, গান্ধীজি যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য স্বার্থের পরেলা নম্বরের শত্রু তখনও তিনি যোগেশ ভেকের নিকট সহজে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন: Even now next to India I would rather live in London than in any part of the world. গান্ধী জীবনের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন এই উক্তিকে কোন বিচারেই অতিশয়োক্তি বলা যায় না।

গান্ধীজির জীবনের মূল ভিত্তি সত্য। এই ভিত্তির উপর তাঁহার যে জীবন-ইমারত গঠিত হইয়াছে উহার প্রয়োজনীয় বিষয় মাল মসলা ঐ ব্যারিষ্টারি অধ্যয়নের দিনগুলিতে সংগৃহীত। প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসও গান্ধীজি গ্রহণ করিতেন, কখনও বিদা করেন নাই। কিন্তু সর্বদাই দেশহিতে লোকহিতে তিনি তাহা যেন কালোপ-যোগী করিয়া 'সোধন' করিয়াই গ্রহণ করিতেন। এইখানেই গান্ধীজির অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। অনুমান করা যায় পাঠদশাতেই তিনি জানত হন পৃথিবীর সার সত্য সকল দেশে এক, কিন্তু দেশ ভেদে লোকভেদে তাহার প্রয়োগ ভিন্ন, তাহার আকৃতি প্রকৃতি পৃথক।

ব্যারিষ্টারি পাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির ছাত্রজীবন শেষ হইল। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ব্যারিষ্টারি পাস করা যত সহজ ব্যারিষ্টারি করা তত সহজ নহে। বোম্বাইয়ে কর্মহীন ব্যারিষ্টারি জীবনে তিনি মূল নিক্ষকের চাকুরির বরখাত করেন। লোক শিক্ষক গান্ধীজি যে ছাত্র শিক্ষকতাও করিয়াছেন সে কথা আর এক দিন বলা যাইবে।

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কালিদাস বসু

জাতীয় সংহতির অভাব ও অনৈক্যের জন্য দায়ী প্রধানত দুটি উপাদান (১) অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব (২) দৃঢ় একটি লক্ষ্যের অভাব। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধ দেশে একটা মানসিক অনিশ্চয়তা, মনস্তত্ত্বে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মর্যাদালাভের প্রবল বাসনা ব্যক্তিকে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। পরস্পর স্বার্থের সংঘাতে অসম প্রতিযোগিতার বিষম প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি-মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত, আদর্শচ্যুত বিচ্ছিন্ন একক। স্বার্থের প্রতিযোগিতা, অহং সর্বস্ব চেতনা ব্যক্তিকে করেছে আত্মমুখী; বিভেদমূলক মনোভাব, ভেদাত্মিকতা বুদ্ধি পরস্পরের মধ্যে লোভ, অবিশ্বাস, ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে, ঐক্য রচনায় অন্তরায় হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ মিলন আকাঙ্খাকে পূর্ণ হতে দিচ্ছে না, সামগ্রিকতার চেতনায় বাধা সৃষ্টি করছে। এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ততা সাধারণ এক লক্ষ্য নির্ধারণে দৃঢ় এক আদর্শ স্থাপনে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। জীবন দৃষ্টির প্রসারতার অভাবে, সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থের ব্যক্তি তার আপাতঃ লক্ষ্যকে বিরাট এবং চরম লক্ষ্যকে সংকীর্ণ করে দেখছে। স্থায়ী মূল্যবোধের অভাবে জীবনাদর্শ হারিয়ে ব্যক্তি এখন ছিন্নমূল উৎকেন্দ্রিক।

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জাতীয় জীবনে একটা বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব, মারকতামূলক একটা শক্তি জনজীবনের গভীরে প্রতিনিয়ত প্রতিঘাত হানছে, সংহতির মূলে আঘাত হানছে—মহাভারতের যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতার শক্তি, তার ক্রমবিকিরণতাকে, ভাঙনের গতিকে রোধ করতে হবে—দর্বার দিয়ে আঘাত চেষ্টায় তাকে জাতীয় ঐক্যের পথে, সংহতি সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে—তাকে সমাজের স্বার্থে দৃঢ় লক্ষ্যে অখণ্ড চেতনার ভাব সম্মেলনের দিকে ধাবিত করতে হবে। এই মারকতা মূলক শক্তি কেবলই সমাজ বিশৃঙ্খলার ইন্ধন দেয়, এই বিভেদ-চেতনা,বিচ্ছিন্নতা বোধ পরস্পরকে করেছে সম্পর্কহীন, যোগাযোগ বিহীন, অসংলগ্ন স্বার্থান্বেষী। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই অনৈক্যের শক্তি, বিভেদ বুদ্ধি জাতীয় জীবনে এতটা সক্রিয় ছিল না বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্য দিয়ে আজ যতটা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারত নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাষাভাষীর দেশ—বিভিন্ন সমাজ সংস্কার, সাংস্কৃতিক অভ্যাস,—এত বিভেদ সত্ত্বেও তার একটা মূলগত ঐক্য আছে। বিবিধের মধ্যে মহামিলন একটা অখণ্ডতা বোধ ভারতীয়তার চেতনা এক প্রাণ একতা এতটা গড়ে তুলেছে।

তথাপি ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে সমগ্র ভারতবর্ষে কখনই একটা সংহত লক্ষ্যবদ্ধ রাষ্ট্রিক চেতনা গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রনীতি-বিদ্‌গণের মতে ভৌগলিক সংহতি, অর্থনৈতিক সংগঠন, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা, ভাষা ও মানসতন্ত্রী—এই পাঁচটি উপাদান মিলিত হয়ে গড়ে তোলে এক জাতি-চেতনা, এক রাষ্ট্রিকতা বোধ। এই উপাদানগুলির অনিয়মিততা বা অনুপস্থিতিতে ঐক্য চেতনার ব্যাঘাত ঘটে, অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। বিপরীতমুখী

গতির মধ্যে, শক্তি-সাম্যের বিভিন্নতায় এই বিভিন্নতা ক্রমেই বিস্তৃত হয়, ব্যবধানে তার দুস্তর বাড়ে। তথাপি একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিধান করেছে, বিরোধী চেতনাকে করেছে বিভেদমুক্ত।

জাতীয় ঐক্য বিধানে ভাষাসংহতি রচনায় শিক্ষাকে এক অভিনব সংশ্লেষের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় সংহতির শিক্ষা অর্থও ভারতীয়তার শিক্ষা। এক : সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই পাঠ্যক্রমের শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। শিক্ষার মৌল অর্থ তার সমধর্মিতা সমগ্র ভারতীয়ের মনে সম-জাতি চেতনা, একটা ভাবগত সাম্য, অখণ্ডতা বোধ জাগাবে ; পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ বিরোধ দূর করবে। দুই : শিক্ষার সর্বস্তরে একটা মৌলিক লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। বর্তমান শিক্ষার সর্বস্তরে (প্রচলিত ধারায়) অধিক পরিমাণে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে, তার বিভিন্ন শাখায় এই বৃত্তি প্রথা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার অবাধ সুযোগ, শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার সর্বশ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তিন : বহু ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ। হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা। হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রচলনকে সহজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তাকে রোমান হরফে প্রচার করা যেতে পারে। এতে অহিন্দী ভাষা-ভাষীদের কাছে হিন্দী ভাষা সহজে গ্রহণ যোগ্য হবে। চার : জাতীয় ভাষা হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রচার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দীকে আঞ্চলিক হরফের সাহায্যেও শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এতে অল্পবয়স্ক ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে হিন্দীভাষা আয়ত্তে আনা সহজসাধ্য হবে। পাঁচ : সংহতির ভাষা হিন্দীর পাশাপাশি সংযোজক ভাষা (link—language) হিসাবে ইংরাজী ভাষাকে কার্যকরী ভূমিকা দিতে হবে, অর্থাৎ জাতীয় ভাষা হিন্দীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজীর সহযোগ সমভাবে সমান রাখতে হবে। নতুবা শিক্ষার উচ্চতর স্তরে, জ্ঞানান্বেষণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইংরাজী চর্চার অভাবে অদ্ভুত বিপর্যয় দেখা দেবে। এই ভাষা জ্ঞানের অভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে—সংযোগ-সম্বন্ধের অভাবে বিশ্ব থেকে ভারত বিচ্ছিন্ন হবে। ছয় : শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। এতে পঠন-পাঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদান সহজসাধ্য ও আন্তরিক হবে। আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তঃ রাজ্যের ভাষাও শিখতে হবে —ফলে পারস্পরিক নৈকট্য বাড়বে, ভাবগত দূরত্ব ঘুচবে। সাত : চৌদ্দ থেকে পঁচিশ বছর বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে আমোদ-প্রমোদ, সৃজনাত্মক কাজকর্ম ও সমাজ সেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ফলে একে অপরকে আন্তরিক ভাবধে, মেলামেশার মধ্য দিয়ে পরস্পর কাছাকাছি হবে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক দূরত্ব ঘুচবে, ভাবগত ব্যবধান দূর হবে। মিলনের মধ্যে আন্তরিকতা বোধ, সঙ্ঘশক্তি গড়ে উঠবে ; ভাবসংহতি জাগবে। আট : বার্ষিক আন্তঃরাজ্য যুব উৎসব, ছাত্র-সম্মেলন কর্ম শিবির স্থাপন করা যেতে পারে—এর দ্বারা পারস্পরিক আদান-প্রদান সহজতর হবে। এই ভাবে সাংস্কৃতিক চলাচলের মধ্য দিয়ে পরস্পর একটা সহমত, একটা ঐক্য গড়ে উঠবে। নয় : বিভিন্ন সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুবক যুবতীদের মনে একটা মূলগত ঐক্য চেতনা আয়ত্ত করা সম্ভব। বহু-উদ্দেশ্য সাধক যুব পরিষদ গঠন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও ভাব-সংহতি সৃষ্টি করা যায়। দশ : সংবাদপত্র, বেতারবার্তা ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বহু বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্যের অনুভূতিটি ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ গোচর করা যায়। পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, মেলা-প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ভারতের ভূগত ঐক্য, তার সামাজিক উত্তরাধিকার, ও সাংস্কৃতিক সাযুজ্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা যায়, সংহতি তাদের মনের গভীরে প্রবিষ্ট করে দেওয়া যায়।

এ ছাড়া জাতীয় সংহতি ও ভাবগত ঐক্য বিধানে শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করা যায়—শিক্ষার ভূমিকাকে আরও ব্যাপক করা যেতে পারে।

এক : ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কেবল তাদের নিজেদের রাজ্যের বিশিষ্ট প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে না. সেই সঙ্গে তাদের অন্যান্য রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া উচিত। এর দ্বারা তারা জানবে কেবল তাদের নিজেদের রাজ্যেই নয় অন্যান্য রাজ্যেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন—যাঁরা তাদের রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমকক্ষ। তাতে তারা বুঝতে শিখবে যে কেবল তাদের রাজ্যেই নয় অন্যান্য রাজ্যেও গর্ব করার মত অনেকেই আছেন। এতে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অমূলক আত্মশ্লাঘা কমবে. নিজেদের সম্পর্কে কল্পিত উচ্চ ধারণা ঘুচবে, অন্যদিকে তেমনি অন্যরাজ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগবে, গর্ব অনুভব করবে। ছাত্রছাত্রীরা জানতে শিখবে সুভাষচন্দ্র কেবল বাংলার নন, তিনি সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ ভারতের, রাণা প্রতাপ কেবল রাজপুত জাতির গৌরব নন, সারা ভারতের গৌরব। গান্ধীজী কেবল গুজরাটের সম্পদ নন, সারা দেশের, সারা জাতির, সমগ্র ভারতের। দুই : দেশের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই সত্যটি স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে সমাজে কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়. প্রত্যেকে আমরা অন্য নির্ভর, সমাজ সাপেক্ষ। পরস্পর আদান-প্রদান, সহযোগিতা ও বিনিময়ের মধ্য দিয়েই সমাজ পরিচালিত হয়—অন্তর-নির্ভরতার নীতিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। বাংলা দেশের কাজে কয়লার জন্য যেমন ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে নির্ভর করতে হয়। তুলার জন্য তেমনি বোম্বাইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে। স্বয়ম্ভরতার অমূলক ধারণার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষতার ধারণাটি গড়ে তুলতে হবে। তিন : ছাত্রছাত্রীদের মনে এই সত্যটি গভীর ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে হবে যে, বহু বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ভারতীয়দের সাধনা, তাদের সাংস্কৃতিক অবদান। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা বর্ণ, নানা মত থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের তার জীবনে একটা ঐক্য সূত্র আছে। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে থেকে ভারতীয় সাধনার এই মৌল লক্ষণটি উদ্ধার করে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে সংস্কার উৎপাদন করতে হবে। —এর থেকেই তাদের মধ্যে জাগবে অখণ্ডতাবোধ ঐক্য চেতনা, এক দেশ এক জাতি একতা। চার : এক জাতি চেতনা, সচেতন ও সক্রিয় একটা জাতীয়তাবোধ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে, নিখিল ভারতকে একাত্ম করে দেখাতে হবে ; ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব, তার ব্যাপকতা তাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। —বিশ্ব থেকে ছিন্ন করে নয়, যুক্ত করে ভারতের স্বাতন্ত্র্য মহিমা প্রত্যক্ষ করে তুলতে হবে, ব্যক্ত করতে হবে। পাঁচ : ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নৃত্য, নাটক, পুরাণতন্ত্র. লোকাচার, জনশ্রুতি, ধর্মাচার ও প্রবাদপদ্ধতির মধ্য থেকে ঐক্যসূত্র, সংহতির দিকটি সার্বজনীন করতে হবে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে মূল সুরটি ধ্বনিত করে তুলতে হবে। সংহত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে আন্তর নির্ভরতা ও অখণ্ডতাবোধ পরস্পর সহযোগিতা ও সহযোগিতার ভাবটি জাগিয়ে তুলতে হবে। পাঠ্যসূচী পরিকল্পনায় এই সামগ্রিকতা একাত্মতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে—এই সর্বাঙ্গীন দৃষ্টি কোন থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। ছয় : সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অন্তর্দেশীয় 'পত্র-মিতালি'র ব্যাপক আয়োজন করে তুলতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই 'লেখক-মিতালি'কে কেন্দ্র করে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। —এর দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা একে অপরকে চিনতে শিখবে, বুঝতে পারবে, কাছে আসবে ; পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব দৃঢ় হয়ে উঠবে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির এই শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা বোধ চেতনা গড়ে তুলবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ একটা অখণ্ডতা এনে দেবে।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রীসুদেবন্ধু রায়

সে বহু বৎসর পূর্বের কথা (৬০ বৎসরের অধিক কাল বলা হইবে) দিনাজপুর সহরে আমাদের পাড়ায় (কালীতলায়) যজ্ঞেশ্বর সেন মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় একটি ছেলে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সুন্দরবর্ণ ছিপছিপে গড়ন। বড় রোগা। নাম শুনিতাম প্রিয়রঞ্জন সেন। মাষ্টার মহাশয়ের ভাগিনেয়, পড়াশুনায় ভাল।

প্রিয়রঞ্জনের জন্মভূমি ঢাকা জিলায়। শুনিয়াছি তাঁহার পিতৃদেবের ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ক্লোরেন্স নাইটিংগেলের সহিত ছিল তাহার (পিতৃদেবের) পত্রালাপ। প্রিয়রঞ্জন পত্রগুলি মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

প্রিয়রঞ্জনের দিনাজপুরের পাঠজীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। উচ্চ বাস্যের জন্য দিনাজপুর ত্যাগ করেন। চাইবাসা যাইয়া কয়েক বৎসর থাকেন। পরে কটক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান এবং আমাদের প্রিয়রঞ্জন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রিয়রঞ্জনের পাঠ্যজীবন কটকে সমুজ্জ্বল। কটকে আই. এ. পড়েন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রিয়রঞ্জনের সহপাঠী। কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং হিন্দু হোষ্টেলে থাকেন। তিনি ডবল এম্. এ. (ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে)। এম্. এ. পাশ করিবার পর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করিয়া পাঠ্যজীবন শেষ করেন। বস্তুতঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। সংস্কৃত ভাষাতেও প্রিয়রঞ্জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি 'কাব্যতীর্থ' উপাধি ধারী। আরও কতিপয় ভাষার উপর তাঁহার দখল ছিল।

কর্মজীবনে প্রিয়রঞ্জন প্রথমে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এইখানে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর মহামনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলেজ পরিদর্শনে আগমন করেন। প্রিয়রঞ্জন, গুণগ্রাহী আশুতোষের সংস্পর্শে আসেন। আশুতোষ প্রিয়রঞ্জনের বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে (প্রিয়রঞ্জনকে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে মনোনীত করেন। এখানে বহু বৎসর সুনামের সঙ্গে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। পরে শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তথা হইতেও কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করেন।

প্রিয়রঞ্জন আবার দেশপ্রেমিক, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, কংগ্রেসসেবক। কতিপয় বৎসর তিনি M. P ও M. L. A. ছিলেন। সাহিত্যরসিক, পণ্ডিত প্রিয়রঞ্জন কতিপয় অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দেশহিতকর বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত এবং একজন বিদগ্ধজন বলিয়া সমাদৃত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়।

এই বৎসরে (১৯৬৭ প্রিয়রঞ্জন 'পদ্মশ্রী' উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলে আমি তাঁহাকে কয়েক ছত্র কবিতা লিখিয়া অভিনন্দিত করি :—

ভাই প্রিয়রঞ্জন।
পদ্মের ভুল্য কান্তিমান॥
জ্ঞান-গরিমায় মহীয়ান।
বিষ্ণুভাবী সুদর্শন॥
'পদ্মশ্রী'তে কি বাড়লো মান।
এ দীন বৃদ্ধ না ভেবে পায়॥

* * *

ইহার উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন :—

১, ডোভার লেন ৩১।১।৬৭

দাদা! খেতাব পেয়েছি একটা।
তারে সামাল দেয়, কেটা॥
এর জন্য কত দেওয়া চাই।
প্রশ্ন আমার মনে সদাই॥
ভাল না মন্দ কিছুই না জানি।
তাই জিজ্ঞাসিলে কিছুই না মানি॥
শুধু ঘাড় নাড়ি আর একটু হাসি।
বলি, ভাল আছি ভালই তো আছি॥
কমে গেছে আজ আমার বয়স।
বেঁকে গেছে দেখি শুধু কোমর॥
তবু আছি আছি ভালইতো আছি।
বাঁচিয়ে রাখেন হরি, তাইতো বাঁচি॥
ইতি সেবক প্রিয়রঞ্জন

আবার এক আশ্বিন মাসে তাঁহার 'সরোজিনী বসু-সুবর্ণ পদক' প্রাপ্তিতে লিখি—

সরোজিনী বসু কোন্ ভাগ্যবতী।
পুণ্যশীলা সাধ্বী-সতী॥
তাঁর স্মৃতি-বিমণ্ডিত পদক সুবর্ণময়।
গুণিগণের প্রাপ্য তাহা একথা যে সুনিশ্চয়॥
এ পদকের অন্যতম অধিকারী—
প্রিয়দর্শী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন।
হলপ্রেষ্ঠ নির্বাচন॥
পদকে বাড়িল মান।
হে ভ্রাতঃ প্রিয়রঞ্জন॥
তুমি অতি ভাগ্যবান।
হরষে চিত্ত আমার মগন॥

ইহার উত্তরে প্রিয়রঞ্জনের কার্য-লিপি :—

পি ৩০ এ, গড়িয়াহাট রোড্, কলিকাতা
২৯, মঙ্গলবার, ভাদ্র '৭৪

শ্রীচরণেষু দাদাগো,
পত্রপ্রাপ্তে এতদিনে উত্তর দিতে হৈল।
লিখিবার শক্তি নাই, নাই বা তা' বৈল॥
সময় কাটিবে ঠিক, নাই কোন ভুল।
যদিও বাণীর কৃপা নাই একচুল॥
দিন নাই রাত নাই অবস্তিতে ভরা।
কর্ম নাই, ক্রিয়া নাই ভাবের ফোয়ারা॥
এই কি জীবন! তবে প্রাণ কোথা আছে!
মনে হয় মৃত্যু যেন ধীরে সরা দিছে॥
একে একে হয়ে গেল পঁচাত্তর বছর।
কেবা জানে কত দুঃখ আছে অতঃপর॥
কোথা সে আনন্দময় বার্দ্ধক্য-জীবন।
সার কথা লিখেছেন যত যোগীজন॥
সোনার পদকে নাহি ছিল মোর রতি।
এ বয়সে আর কেন এ হেন দুর্গতি॥
তথাপি যে গিয়েছিনু, দেবের প্রসাদে।
বন্ধু হোক বহুজন গুণিগণ সাথে॥
মাত্রা হোল ভুল, দেখেছেন নিশ্চয়।
সবে বলে অয় তব, মানি পরাজয়॥
ইহাও অদৃষ্টে ছিল হ'য়ে গেল ভোগ।
সঙ্গে আছে অবিরত কর্ণনাশা রোগ॥
মনের দুঃখেতে আজ লিখিলাম কত।
এখন বিদায় হই প্রণাম সর্বত॥
(কুশল প্রার্থনান্তে)
যাচে প্রিয়রঞ্জন সেন।
আমার বিনীত নতি সকলে নিবেন॥

অমর বঙ্কিম তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রকে পাঠ লিখিতেন 'অসেচনক'। অভিধান

খুলিয়া দেখি এই শব্দটির অর্থ 'অতিপ্রিয়দর্শন।' 'যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না এরূপ। তবুও যদি এই শব্দটি মনে মনে এবং প্রকাশ্যে যাঁহাদের উপর প্রয়োগ করিতাম প্রিয়রঞ্জনের স্থান ছিল তাহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চে। তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ ও তৃপ্তির সীমা থাকিত না। সোদর-প্রতিম প্রিয়রঞ্জন। কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য স্নেহভাজন। সুন্দর সুগঠিত দেহ। জ্ঞানদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু। শান্ত নম্র প্রিয়দর্শন। মিষ্টভাষী-সদালাপী জ্ঞানবৃদ্ধ-সুবক। প্রিয়রঞ্জন ছিলেন অশেষ গুণের আকর।

আজ প্রিয়রঞ্জন শান্তিধামে। বহুবৎসর পূর্বে একবার তাঁর জন্মজয়ন্তীতে অঙ্কম হস্তে লিখিত এই কবিতাটি তাঁহাকে প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলাম। আজ সেটি পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া তাঁর প্রতি স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধায় প্রণতচন্দন নিবেদন করিয়া এ পুত-জীবনকথা শেষ করিলাম!

আচার্য রঞ্জন—একাধারে প্রিয় ও রঞ্জন তিনি—
অর্থ তাঁহার নাম—। হেন যোগ্য
নাম তাঁর কে রাখিল—
চিন্তি মনে মনে। বিদ্বান-বিনয়ী আর
উদার হৃদয়,
সদালাপী-প্রিয়ভাষী-ধীর-বিচক্ষণ।
জ্ঞানার্ণবে অবগাহি, লভি মণিমুক্তাআদি
অমূল্যরতন, বিতরেন অকাতরে প্রিয়
শিষ্য দলবলে।
জ্ঞানের কিরীট শিরে, উজ্জ্বল ভাস্কর।
যশীবরপুত্র তিনি গৌরব মোদের।
কি আর অধিক কব—বড় ভালবাসি তাঁরে।
উঠিলে রঞ্জন-কথা সে প্রসঙ্গ তেয়াগিতে
একান্ত অক্ষম আমি। যদি ধাতা দানিতেন
শতমুখ মোরে, শতমুখে গাহিতাম
রঞ্জন-চরিত-গাথা, পরম সুন্দর আর
অতীব মহান।

সংবাদ

স্কুলে হাজিরা: মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বলেছেন, শিক্ষার্থীকে শতকরা ৭০ দিন অন্তত বিদ্যালয়ে হাজির হতে হবে, যার অন্যথায় কোন প্রার্থীকে পর্ষদের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।...

[যুগান্তর ২৪।৮।৬৮ সম্পাদকীয়]

মাধ্যমিক শিক্ষা: পশ্চিমবঙ্গের ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহা রূপায়ণের জন্য ভারত সরকারের নিকট অতিরিক্ত ২৬ কোটি টাকা চাওয়া হইয়াছে। এই অর্থ পাওয়া গেলে নূতন স্কুল হইবে, বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বাড়িবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীর হইবে না দ্বাদশ শ্রেণীর হইবে তাহা লইয়া আবার ভাবনা চিন্তা সুরু হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

শিক্ষায় দারুশিল্প

শ্রীচৈতন্য চরণ কর্মকার

(শিক্ষক জামবণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

"যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি"

—"Education is living"—একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে সমগ্রজীবন ব্যাপী চলছে শিক্ষার লীলা।

এই লীলাকে ঘিরে বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ লক্ষ করেছে নানান অভিজ্ঞতা। তাই জটিল বন্ধুর আবর্তসঙ্কুল পথ পরিক্রমায় বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বে ও সমন্বয়ে নিজেকে করেছে উপযুক্ত, এগিয়ে চলেছে অবিরাম —চলেছে জয়যাত্রা, পরিশেষে মহাশূন্যে উড়িয়ে দিয়েছে জয়ের নিশান। এই জয়যাত্রার পাথেয়ের পিছনে আছে তার শিক্ষা—বিচিত্র অভিজ্ঞতা—তার বাঁচার প্রক্রিয়া আর প্রয়োজনের তাগিদ। আর একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে, এর মূলে আছে উৎপাদন,—শিক্ষার ফল। অবশ্য উৎপাদন আমরা কিছুই করি না, করবার ক্ষমতাও নাই, যা করি তা রূপান্তর মাত্র,—পরিবর্তন মাত্র। এই পরিবর্তন দু রকমের,—বহির্লোকে আর অন্তর্লোকে। অন্তর্লোকের পরিবর্তনে হচ্ছে উপযুক্ত মানুষ উৎপাদন আর বহির্লোকের পরিবর্তনে হচ্ছে মানুষের উপযোগী নানান্ পার্থিব দ্রব্য সামগ্রী। অবশ্য উদ্যোক্তা সেখানে মানুষ এবং তার বাঁচার তাগিদ সার্থক ভাবে বাঁচার তাগিদ।

সমগ্র জীবনের বাঁচার প্রক্রিয়াটাই যদি শিক্ষা তাহলে সমগ্র পৃথিবী ও সমাজই হলো শিক্ষায়তন আর সাধারণতঃ আমরা যাকে শিক্ষায়তন বলে থাকি তা হলো তার ক্ষুদ্র সংস্করণ বা সমাজে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। উৎপাদনকে বা রূপান্তরকেই কেন্দ্র করে চলছে যখন মানব সমাজের জীবন ধারা তথা পৃথিবীর প্রাণসত্তা, তাহলে বিদ্যালয়েই বা কেন হবে তার ব্যতিক্রম। সেখানেও চলবে উৎপাদনের প্রক্রিয়া—এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়া, অন্তর্লোকের এবং বহির্লোকের। বহির্লোকের পরিবর্তন সাধন করতে গেলে চাই মানুষের অন্তর্লোকের গুণাবলীর কার্যকারিতা বা অন্তর্লোকের সুষম বিকাশ। অপর পক্ষে অন্তর্লোকের বিকাশ হয় বহির্লোকের পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে।

যে জাতি যে সমাজ এই দুটো পরস্পর নির্ভরশীল উৎপাদনকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে গেছে তারাই ততো হয়েছে উন্নত। জীবন ধারণ তাদেরই হয়েছে সার্থক। শুধু সার্থক নয় সর্বার্থক। তাই অন্তর্লোকের পরিবর্তন করতে গেলে অর্থাৎ যথার্থ মানুষ তৈরী করতে গেলে বহির্লোকের পরিবর্তনকেই করতে হবে কেন্দ্র, এক কথায় পার্থিব বস্তুর উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই ঘুরবে শিক্ষা। জটিল জীবন যাত্রার বহু বিচিত্র সমস্যার সঙ্গে মানুষ জড়িত। আর বিভিন্ন মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাও বহু বিচিত্র। একই খাতে বাধিত হতে চায় না কোন দিন, বৈচিত্র্যও প্রয়োজন। উপরন্তু শিশু মন সৃজনী মন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের একটি অঙ্গ হিসাবে দারুশিল্পকে স্থান দিলে কি কোন অন্যায় হবে? মানব সভ্যতার ইতিহাসে কাষ্ঠ ও তক্ষর অবদান তো কম নয়?

আপাতত দেখা যায় দারুশিল্পকে কেন্দ্র করে আমেরিকা, পোল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, জার্মানী, নরওয়ে প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য দেশে কাঠের কাজ, কাঠের ব্যবহার, তার ইতিবৃত্ত, এ সমস্তই এক বড় জানবার ও শিখবার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে বহু গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নাই। কত রচনা, সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে—"Cassell's Joinery and woodwork" H.E.Desch এর Timber its structure and properties এর মত কত মূল্যবান পুস্তক। অথচ আমাদের দেশেই তার ব্যতিক্রম কেন? যদিও আমাদের দেশে দেরাদুন Forest Research Institute এর নাম শোনা যায় কিন্তু এই শুষ্ক দেহখণ্ডটা নিয়ে দেশে খুব একটা মাতামাতি চলছে, এতো শোনা যায় না। তা ছাড়া এসম্বন্ধে পত্র পত্রিকা তো বাদই দিলাম কাঠের কাজ বা দারুশিল্প সম্বন্ধীয় বই এর সংখ্যা একটা নিম্নতম অঙ্কেই সীমাবদ্ধ। অথচ যে দেশে রবীন্দ্রনাথেই একদিন সত্যেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের "কাঠের কাজ" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখে গেছেন—"সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাদের এবার নৌকাডুবির পালা ·····ভদ্রলোকদের ভয়ে ছুতোরের কাজ নাম দিতে পারেন নাই। যাহোক বইখানি সকলের কাজে লাগবে, কেবল-মাত্র জীবিকার জন্ত নহে শিক্ষার জন্ত।"

কিন্তু তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে কই তার প্রসার ও বিস্তার। দারুশিল্পটাই যেন শিক্ষাক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে অবহেলিত। না জানি হয়তো বা তথা কথিত ভদ্রলোকদের অমূল অন্তঃ অঙ্গুলী হেলনেই তার শুভ উবিয়ে যাচ্ছে। হায় অন্ত আজ কোথায় গেল গান্ধীজির ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বুনিয়াদী পদ্ধতি। প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপেই হলো ব্যর্থতার অবলোপন। কিন্তু একথা জানা দরকার যে বর্ত্তমানে Timber as an Engineering materials হিসাবে বিদেশে প্রচুর গবেষণা চলছে। এবং তারই ফলে তার বহিবার ক্ষমতা অনুসারে লোহা তামা এলুমিনিয়ামের পাশে প্রযুক্তি বিদ্যা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই যাদেরই এই ছুতোরের কাজের প্রতি এত ঘৃণা তাদের ছেলেদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে গেলে হয়তো বা কাঠ বিষয়েও আলোচনা করতে হবে। ভাল ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলেও ছুতোরের কাজই তার প্রথম পদক্ষেপ, ইঞ্জিনিয়ারীং বহু বিষয় ও পদ্ধতি—Drilling, milling, Turning প্রভৃতির ছুতোরের কাজের মাধ্যমেই আলোক সম্পাত হয়ে থাকে। এগুলো জানা থাকলে যথাসময়ে—Strain in border materials এর ক্ষেত্রে Transfer of Training এর সুযোগ এসে যাবে এবং শিক্ষা আরো সহজতর ও সন্তোষজনক হবে।

আর একথাও বোঝা উচিত যে একদা শৈশবাবস্থায় নিঃসহায় মানুষ যার শাখাশ্রয়ে আশ্রয় বেঁধেছে প্রবল প্রাবন পীড়ন শুরু তাঁরই বিপুল আশ্রয়ে সবলে দাঁড়িয়ে নিঃসহায় একাকি হয়েও প্রাণ বাঁচিয়েছে। যুগ যুগ ধরে যারই সুশীতল ছায়ায় ক্লেদাপ্লুত ক্লান্তিতে ভ্রান্তি দূর করেছে, গুহাকন্দর থেকে আরম্ভ করে সভ্যতার বর্ণবার পর্যন্ত যার এত অবদান তাকে এত অবহেলা কেন? কেনই বা আমরা ভুলে গেছি ইতিহাসের এই বীরত্ব গাথাকে, কেন ভুলে গেছি প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞানের সেই বেদীমূলে বোধিদ্রুমকে, প্রকৃতির খেলাঘরে যাদিনীর অষ্টধাকে কেনই ভুলে গেছি এই সেদিনের সেই ব্যায়াময় হাতিয়ের ছায়াকে? ভুলেই বা যাই কেন মাঠের মাঝে খেলা হলেও শুরুমূলেই আমাদের বাসা আর এই শুরুর শাখায় শাখায় ঘোরেন ভাসা নিত্য জাগায় সকাল সন্ধ্যাবেলা। ভুলে যে যাই কারণ আমরা অকৃতজ্ঞ। তাই আমরা এ হেন উপকার পেয়েও তার শুরুত্বটাকে মর্য্যাদা দিতে পারি না—

নিয়োগ করেছি তাকে প্রতিনিয়ত গৃহস্থাল্যের কাজে। অথচ তাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে রাজহংসের ডানা দিয়ে বাগ্দেবীর বাহন করাও তো যেতে পারে। এবং তাতে যে আমরা কতো মহৎ কতো উন্নত হতে পারব সেকথা তো ভাবিয়ে দেখি না। দেখবার প্রয়োজনও বুঝি বোধ করি না।

ইতিহাসের এই নীরব সাক্ষী শুষ্ক তথ্য শুষ্ক তারিখ সঙ্গে আমাদের কত কথা কত সংস্কারই না জড়িত। এই শুষ্কমূলকে কেন্দ্র করেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা আগেই বলেছি। শুষ্ক মূলেই একদিন আমরা বেত প্রতিমা প্রত্যক্ষ করেছি, তাই আজও আমাদের মধ্যে শুষ্কের মূলে পুজো দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এবং তাতে তাদের মুক্তি ও বাহন ইত্যাদির মূর্তি গড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এ থেকে বহু মূল্যে শিল্প কীর্তির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। গাছের ফোটরে অনেক সময় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কারণ গাছ বহু-বৎসর জীবিত থাকে। গাছের সঙ্গে জড়িত অনেক গল্প, গাথা কিংবদন্তী ও প্রচলিত আছে। তাতেও আমরা অতীতের বহু সন্ধান পাই। এভাবে গাছ আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন সময়ের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণাও এসে পড়ে। এভাবে দারুশিল্পের মাধ্যমে ইতিহাসের পাঠকে Correlate করে শিক্ষাকে আরো সহজতর করে তুলতে পারা যায়। ভূগোলের অঙ্গের বিষয়েও তাই। কাঠের কাজে প্রবৃত্ত হলেই কাঠ সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্যই বাড়বে প্রয়োজনীয় কাঠকে জানতে হবে চিনতে হবে, বিভিন্ন কাঠের স্থায়িত্ব, ক্ষমতা, কোথায় জন্মে, কিরূপ জলবায়ুতে জন্মে সেখানে বৃষ্টিপাত উত্তাপ ইত্যাদির আলোচনা আবশ্যক. ফলে দারুশিল্পের মাধ্যমে ভূগোলের পাঠকেও Correlate করার বেশ সুযোগ বা এইভাবে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েরও অবতারণা চলে আসে কারণ কাঠের ব্যবসায়ের মূল্য কম নয়। কাঠ কোথায় বেশী জন্মে, কোথায় আমদানী হচ্ছে রপ্তানী হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। এবং যারা ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্য করবে বা ঐসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকবে তাদেরও মোটামুটি একটা কাঠামো হয়ে যায় দারুশিল্পের মাধ্যমেই।

বহুভাবেই কাঠ আমাদের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তাই এই শুষ্ক তরুখণ্ড-টাকে তরুদেহ না বলে শিক্ষার তরুতরু বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানবৃদ্ধিই হয় তাহলে এইবাকখণ্ডের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের শেষ নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানসিক, আত্মিক এবং দৈহিক শক্তির বিকাশকেই বুঝায় তাহলেও কাঠের জ্ঞান ও কাঠের কাজ যে সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। যার সম্বন্ধে পড়লাম, তাকে চোখে দেখলাম আর নেড়ে-চেড়ে মনোমত কেটেকুটে রূপ দিলাম। জ্ঞান লব্ধের সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ শিল্পসৃষ্টির সময়ে নিশ্চয় মানসিক এবং শারীরিক শক্তির পরিপুষ্টি হবে না। আর সৃষ্টির যে আনন্দ—একটা কিছু গড়ার মধ্যে যে আনন্দ যে আত্মতৃপ্তি তাকে কি আত্মিক উন্নতির সহায়ক বলে নিতে পারি না? মনে হয় শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ট যোগাযোগের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না।"

অনেক ছেলেকে ক্লাসে অন্যমনস্ক দেখি, তার কারণই এই যে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবী কোনই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে.....দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছি না, দেহের দ্বারা আমরা যে সকল কাজ করি সেইসব কাজের চর্চা—যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তা

জড়তা দূর হয়, সেই কাজের প্রণালীর ভেতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়। সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটায়। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্মক্ষমতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয় নি সে যতবড় পণ্ডিতই হোক সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয় সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। কবি এখানে এমন একটা কাজের চর্চার কথা বলেছেন যে একটু বেশ তলিয়ে দেখবার বটে। খেলাধূলা নয় ব্যায়াম নয় আবার গতানুগতিক কাজটাও নয়। তবে কি কি সে কাজ? শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মনীষীর উক্তি ও ধারণা মিলিয়ে যেমন শিক্ষার প্রস্তুত সংজ্ঞাটা তুলিয়ে যায় এক্ষেত্রেও তেমনি এই কাজটার কোন একটা সুস্পষ্ট ধি পাওয়া যাচ্ছে না। কবিগুরু বোধ হয় "সেইসব কাজের চর্চা বলতে নিশ্চয়ই শিল্প চর্চার কথাই বুঝিয়েছেন কারণ ইতিহাসও সাক্ষ্য দিয়ে আসছে যে শিল্প-চর্চায় দাক্ষিণ্য অতি প্রাচীন কাল থেকে আত্ম-নিয়োগ করেছে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহ যে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে—যার উপর শিক্ষা নির্ভরশীল—এই দাক্ষিণ্যের অবদান অপরিমীম।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষানুধ্যান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

অতএব শিক্ষার তথা দুনিয়াদী ও অদুনিয়াদী শিক্ষার মৌল লক্ষ্য মনুষ্যত্ব অর্জন করা তারপর দেবত্ব লাভ করা। এই ভাবানুযায়ী আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনেকটা সার্থক। কেন না ভারতের ভিত্তি হলো ধর্মের উপর সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্মকে ধরেই মহাত্মাজী সবরমতী আশ্রম বিদ্যালয়, মালব্যজী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কবিগুরু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে কিছুটা দেবমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে ছিলেন। এরই ফলস্বরূপ আমরা একদল জনসেবক পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম যার জন্যে স্বরাজ হ'য়েছে যুক্ত ভারত পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে। প্রসঙ্গত বলা যায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক ফ্রায়েড্ কিছুটা ঐ অধ্যাত্মধর্মী শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছেন—শিক্ষা হবে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্মী। পরন্তু কেন্দ্রে এ পথ পছন্দ করেন না, কেবল মাত্র জৈব ধর্মী শিক্ষার জন্য তাঁর বিষাদ। হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রকৃতির ওপর নিবদ্ধ—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" কিংবা "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" কিন্তু বৈরাগ্য না অভ্যাসে মানুষ কি মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারে?

সম্ভবতঃ শিক্ষার সমগ্রবিন্যাস সংযম সাধনার উপর স্থাপিত, যম নিয়মাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার সমূহ বিন্যাস অর্পিত হ'লে মানুষ সুরস্ত হ'য়ে উঠে। সমস্ত রাষ্ট্র দুর্দৈবের সম্মুখীন হয় যেহেতু পর্যাপ্ত

খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে অজ্ঞানের সুশিক্ষিত ব্যক্তি পরিমাণ মতোই গ্রাস করে, অসংযমের দুঃখভোগ করে। এক্ষেত্রে সংশিক্ষাই তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তত শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য তাই বিজ্ঞান কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রমে মানুষ ত্যাগ সত্য সেবা ন্যায় ধর্ম ভুলে যায়, স্বার্থ নিয়ে মারামারি শুরু করে কিংবা অর্থ না বুঝেই মন্ত্রমত নিয়ে বিরোধে মাতিয়ে বসে আর এরূপ পরিবেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সার্থকতাকে জনমানসে ভূষিত করে অথবা কেবল কেরানী সৃষ্টিকারী শিক্ষার বিস্তার করে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য অন্য মানুষ অহঙ্কারকে বরণ করে। ধর্মের মৌল নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে হয়তো এই যুক্তি যে তঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় নিয়ত হয়ে ঐ শিক্ষাকে অনুকরণ করে শিক্ষার সঙ্কট ভ্রান্ত পদ্ধতিতে চলছে। বৈষয়িক তথা বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষায় বিরত হয়ে যায় পরিণামে অনৈক্যের বিসৃষ্টি ঘটছে। বস্তুতঃ-পক্ষে সত্যকে বস্তুতঃ করে আত্মসুখ স্বার্থসিদ্ধি ও সংরক্ষণমূলক শিক্ষা কখনো মানুষকে শান্তিস্বস্তির আসনে নিয়ে যেতে পারে না। সম্ভবতঃ এই হেতু শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি ভারতের বুকে কেবল অনাসৃষ্টিই করে চলেছে—জনমনের অন্তরে ক্ষোভের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। সুতরাং শিক্ষার মৌল নীতি শিক্ষার অধিকার ও ধারা নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়—এই হেতু শিক্ষক অভিভাবক রাষ্ট্র কর্ণধারদের যোগযুক্ত আন্তরিকতা দরকার—শিক্ষা, পরিকল্পনা বিস্তারকারী করা, কার্যকরী করা একান্ত প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের দিগদর্শনে শিক্ষা-সম্পর্কিত বার্তায় জানা দরকার জীবে প্রেম জীবে দয়া জীবের সেবন করেই শিক্ষার ফল লভে সর্বজন। 'জগতের প্রাণে প্রাণে শিবের প্রকাশ, শিবজ্ঞানে হয় অহঙ্কার নাশ। ভ্রান্তমূক মন প্রাণ বিত্ত হৃদয় প্রণিপাত প্রশ্নযোগে শিক্ষা মধুময় হয়। নিজের মনতে যাহা জানে তা সবার কল্যাণ-হেতু করে যা করার। সুতরাং জীবের সর্বোচ্চ মণিময় কোঠায় আরূঢ় হবার জন্য সর্বাগ্রে দরকার নিজেকে জানা ও অন্যকে চেনা। নিজেকে যে জন জানে চিনে নিজ জনে শান্তি ও সম্মান তার বাড়ে দিনে দিনে। এক্ষেত্রে চাই পবিত্র অন্তর ব্রত নিষ্ঠা ও উচ্চ মন।

মুখ্য কথা হলো জীবনের জাগরণ ও চৈতন্য সত্তার প্রস্ফুরণ ঘটানো দরকার। কেননা জীবনের জাগরণ মর্ম সূর্যোদয় চৈতন্য প্রভাতে সূর্য অথবা অন্যান্য চৈতন্য জাগ্রত হলে খুলে যুক্তি যায় হৃদগ্রন্থি ছিন্ন হয় আনন্দ অপার।

কিন্তু এজগৎ নির্বিরোধী নয় বলে বিরুদ্ধ মতি-গতি রতি বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সর্বত্রই সঞ্চারিত বিপুল বিক্রমে। এই অপরা মতিগতি বৃত্তি-প্রবৃত্তি প্রকৃতির বাতাবরণে ব্যক্তিগত ভোগবৈচিত্র্যের অন্তহীন আয়োজন যার জন্যে মানুষ কেন জীবমাত্রেই নিরন্তর চঞ্চল মুখর। তাই অভ্যাসের দ্বারা স্বভাব গঠন করা একান্ত কাম্য—শুধু তাই নয় এই ক্রমে সুখ-দুঃখাদিও ভোগ করে। সেইজন্য বলতে হয় স্বভাব দেউল হয় অভ্যাসে নিষ্ঠায়। অনভ্যাস হীনমিষ্ঠা বাধ্য প্রতিষ্ঠায়। মানুষ আনন্দে মেতে অভ্যাস হারালে অবেদ দুর্গতি নিচু প্রতিপদে চলে। সুতরাং সকালে ভ্রমর করে মধু আহরণ—বিদ্যার্থী করে নিত্য বিদ্যার্জন। তেমনি জীবনের প্রথম প্রভাতে যে আঁখি দর্শন করে আকাশ সেই আঁখি মেলে ধরে শিক্ষা সম্পর্কিত যত পরীক্ষা ক'রে মর্তের মানুষ মুক্ত হয় জগতের মোহ পাশ হতে। আলস্য ও জড়তাকে পরিহার করে অনাময় পরিবেশ রচনায় ব্রতী হয়। এইভাবে মানুষ জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যলাভের সঙ্গে পারত্রিক সুখও আনন্দ লাভ করে।

সুতরাং কালক্ষয় না করে যাতে জীবন ধন্য হয় জনম সার্থক হয় সেই শিক্ষা লাভের জন্য জেগে—ওঠো—প্রাপ্য বর গ্রহণ কর—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ওঁ যিনি ত্রিলোকাধিপতি রুদ্র, সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদেরকে শুভ বিদ্যায় কর্মে মতিতে সংযুক্ত করুন।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

———

গান্ধী শতাব্দী পুস্তক ভাণ্ডার

মহাজাতি সদন

১৬৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৭

গান্ধী শতাব্দী উপলক্ষে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রকার গান্ধী সাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রকাশকদের পুস্তক এখানে পাওয়া যাইবে ঃ

(১) নবজীবন ট্রাষ্ট, আমেদাবাদ

(২) সর্ব সেবা সংঘ, কাশী

(৩) গান্ধী স্মারক নিধি

(৪) প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার

(৫) সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

(৬) গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

গান্ধী শতাব্দী উপলক্ষে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে

Silcha Regd. 02830

শিক্ষায়

পুস্তক-পুস্তিকাদি

24 FEB 969

বিজ্ঞাপন প্রকাশ

লাভজনক

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাগণ
সুবিধাজনক চুক্তি করিতে পারেন

শিক্ষায় ঠিকানা

শিক্ষার গ্রাহক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এখন হইতে টাকা-কড়ি, প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করেন।

শ্রীনাগেন্দ্রকুমার ঘোষ, পরিচালক,
শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড কর্তৃক ৩৫।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
শ্রীনগেন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত : শিক্ষা। সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

২৬শ বর্ষ
১০ম, ১১শ সংখ্যা

শিক্ষা

ভাদ্র, আশ্বিন
১৩৭৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা, এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে, মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে

—রবীন্দ্রনাথ

সূচী

ফ্রান্সেসের ফ্লরিডে বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৫
রেজাউল করীম

অনুরাশিকা ক্রিয়া ১৪৮
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

আত্মসমীক্ষা ১৫৩
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মহাজীবনের পুণ্যালোকে ১৫৬
শ্রীকানাইলাল দত্ত

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সমস্যা ১৬০
শ্রীঅরুণকুমার মিত্র

ভাষার শক্তি ও মাহাত্ম্য ১৬২
শ্রীনিত্যেন্দ্রকুমার নাগ

অবিস্মরণীয় ঘটনা—১৫ ১৬৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১৬৭
সংক্ষিপ্ত জীবনী

সংবাদ ১৭৮

র‍্যালফ ওয়ালডো ট্রাইন-এর

বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

In Tune with the Infinite-এর

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কৃত অনুবাদ

অনন্তের সুরে

মূল্য তিন টাকা মাত্র

এশিয়া পাবলিশার্স

১৫৮-বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৪

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৪০ পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৫০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩০৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৫৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ৬০৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ৪০৲, সিকি পৃষ্ঠা ২৫৲ টাকা।

৩। প্রবন্ধাদি, টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র শান্তিরঞ্জন দাস, পরিচালক, শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কর্ম্মসু দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৬শ বর্ষ | ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৭৫ | ১০ম ১১শ সংখ্যা

রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়

রেজাউল করীম

চিন্তাশীল লেখক হিসাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। তাঁর নূতন কোন পুস্তক প্রকাশিত হলে বহু লোক তা আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। তাঁর সব কথার সহিত অনেকে একমত হতে পারেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যে যে চিন্তার খোরাক আছে তা সকলেই স্বীকার করেন। সেইজন্য তাঁর যে কোন বৈপ্লবিক মত নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে বহুবিধ আলোচনা হয়ে থাকে। একথা অনেকে হয়ত জানে না যে রাসেল একজন শিক্ষাবিদও বটে। শিক্ষা বিষয়ে তিনি বহু নূতন কথা বলেছেন। আমরা গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী। আমরা রাসেলের শিক্ষানীতির বহু বিষয়ের সহিত একমত নই। তবুও একজন চিন্তাশীল ও সংবেদনশীল মানুষের অভিমতের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে যাঁরা দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের ত এসব বিষয় জানা খুবই প্রয়োজন। আমরা রাসেলের সব কথাকে স্বীকার না করতে পারি। তবুও একথা অকপটে বলব যে, তাঁর মতের একটা মূল্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রাসেল যে সব কথা বলেন তা নিয়ে আজ কিছু আলোচনা করব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ শ্রেণীর ছাত্রের অধ্যয়ন করা উচিত, এ নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠে থাকে। ছেলে-মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলে অভিভাবকদের একান্ত ইচ্ছা যে, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন। কিন্তু রাসেল বলেন এর কোন দরকার নাই। এতে অর্থ, প্রতিভা ও শক্তির অপচয় ঘটবে। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠবে, অসংখ্য পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই অল্প সংখ্যককে বেছে নিতে হবে তাদের যোগ্যতা, প্রবণতা প্রবৃত্তি ও উপযুক্ততা অনুসারে। বিশেষভাবে দেখতে হবে যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে আসবে, তাদের দ্বারা সমগ্র জাতির কোন উপকার হবে কিনা। তাতে জ্ঞানের প্রসার হবে কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তারা তাদের জ্ঞানকে জাতির

কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করতে পারবে কিনা। যার মেধা নাই, মৌলিক প্রতিভা নাই, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্র-ছাত্রী যদি দরিদ্র হয়, তবে রাষ্ট্রকে তাদের উচ্চতর শিক্ষার সকল ব্যয় ভার বহন করতে হবে। কিন্তু নির্বিচারে অথবা অল্প বিচার করে যে কোন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়ার নীতির তিনি ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে সমাজ একথা জানবার জন্য দাবী করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, তাতে সমাজের বিশেষ উপকার হয় না, তবে অত ব্যয় করার কোন অর্থ হয় না। রাসেলের মতে বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। প্রথমতঃ কতকগুলি বিশেষ ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বমূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করবে। জ্ঞানের জন্য ও উচ্চতর আদর্শের জন্য শিক্ষা দেওয়া এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ ফলের দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। এই ধরনের আদর্শমূলক শিক্ষা দিতে গেলে হয়ত বহু বছর ধরে কোন ফল লাভ হবে না। কিন্তু তবুও সাধারণভাবে জ্ঞানের উন্নতির জন্য এই প্রকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে—এবং তদনুরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার অপর দিকে যাদের কেবল গবেষণা করবার যোগ্যতা আছে তাদেরকেও বেছে নিতে হবে কঠিন পরীক্ষার দ্বারা। টাকা পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা থাকলেই চলবেনা। যোগ্যতা ও বহুবিধ মানদণ্ড থাকা দরকার। চারিদিকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে, তাতে এমন সব ছাত্রকে ভর্তি করা হয়, যারা পাঠ সমাপ্ত করার পর জ্ঞান বিস্তারের জন্য কিছু করে না। তারা পাশ করে চাকরি করে। ও ছাড়া আর কোন কাজে তারা আসে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের সামাজিক মর্যাদা আছে, অথবা যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরই মনোনীত প্রার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সেখানে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা শিখতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি। এসব বৃত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে উপায় করতে পারা যায় না। যাদের অভিভাবক এই ধরনের শিক্ষা ব্যয় বহন করতে পারে না, তাদের পক্ষে এসব বিষয় শিক্ষার পথ একরূপ রুদ্ধ। কারণ দরিদ্র অভিভাবকের এত ব্যয় করবার ক্ষমতা নাই। যাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে প্রতিভা আছে, যাদের রুচি ও প্রবৃত্তি আছে, এমন সব দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের জন্যও ঐ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্তির পথকে সুগম করে দিতে হবে, তাদের বিনা বেতনে পড়বার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করে দিতে হবে—এ দাবী করার অধিকার সমাজের আছে। দেখা গেছে যে, দরিদ্রের সন্তানগণ সুযোগ ও সুবিধা পেলে ভাল চিকিৎসক ও ভাল ব্যারিষ্টার হয়েছে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছাত্রগণও যেন সর্বপ্রকার সুযোগ পায়। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়না। ফলে মেধা ও প্রতিভার শোচনীয় অপচয় হয়। তাই রাসেল বলেন যার টাকা আছে, কিন্তু যোগ্যতা নাই এমন কোন ছাত্রকে কঠিন কঠিন বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত হবেনা। তাঁর মতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাবে কেবল যোগ্যতম ছাত্রগণ। তাদের আর্থিক অবস্থা যতই শোচনীয় হোক না কেন, তবুও যদি প্রতিভা থাকে তবে তাদেরকেই বেছে নিতে হবে। তা যদি হয় তবে এই সব বৃত্তিতে কেবল উপযুক্ত লোকই প্রবেশ করতে পারবে। অনুপযুক্তদেরকে বাদ দিতে হবে

—এতে প্রতিভার অপচয় হবেনা। রাসেল বলেন যে, বিশেষভাবে প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে যারা শিখবে তারা রাষ্ট্রের খরচেই শিখবে। সুতরাং পিতামাতার আর্থিক অবস্থার প্রশ্ন উঠবে না। এমন কোন লোককেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত হবে না, যারা যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না। আর যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়ার পরও দেখতে হবে যে ছাত্রগণ ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। যারা তা পারবেনা, তাদেরকেও বাদ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অলস বিত্তবানদের স্থান এ ধারণা দূর করে দিতে হবে।

সাধারণ স্কুল কলেজে একটা রুটিন মাফিক বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে কাজ করা হয়। রাসেল বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ধরনের কোন ব্যবস্থা থাকবেনা। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় যে, লেকচার ওয়ার্ক বা নির্দিষ্ট সংখ্যক কতিপয় বক্তৃতার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। বক্তৃতার ব্যবস্থা না থাকলে যেন শিক্ষাই হয় না। কিন্তু রাসেল বলেন এ পদ্ধতি ঠিক নয়। তাঁর মতে এ ধরনের বক্তৃতার দ্বারা কেবল সময়ের অপচয় হয়। তিনি বলেন এটাই হবে আদর্শ ব্যবস্থা—যখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেশন" আরম্ভ হওয়ার সময় অধ্যাপকগণ ছাত্রদেরকে কতকগুলি পুস্তকের তালিকা দিবেন। ছাত্রগণ সেইসব বই বন্ধু সহকারে পড়বে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পুস্তকের তালিকাও দিবেন। সেগুলি হবে রেফারেন্সের বই। এগুলি বিশেষভাবে ছাত্রকে পড়তে হবে না। তারা প্রয়োজন মত পড়বে। অধ্যাপকগণ মাঝে মাঝে ছাত্রদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করবেন। তাঁরা কতকগুলি প্রশ্ন দিবেন। বইগুলি পাঠ করে ছাত্রগণ সেইসব প্রশ্নের উত্তর রচনা করবে। প্রয়োজন হলে অধ্যাপকগণ আলোচনা করে তাদের ভুল সংশোধন করে দিবেন। অধ্যাপকগণ সপ্তাহে একদিন অথবা পক্ষ কাল পরে একদিন ছাত্রদের সঙ্গে একত্র বসে গল্পগুজব করবেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন। আলোচনা করবেন। তারা যেসব কাজের ভার নিয়েছে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছামত কোন বিষয় নির্বাচন করে তবে তাকে সে স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। মোটের উপর ছাত্রকে সাহায্য করবার জন্য অধ্যাপক সবসময় প্রস্তুত থাকবেন।

আজকাল পরীক্ষাকে ভিত্তি করে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা রাসেলের মতে শিক্ষাই নয়। তা শিক্ষার নামে সময় ও অর্থের অপচয় মাত্র। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে নিয়মিতভাবে ক্লাসে বক্তৃতা দিতে হবে না। সুতরাং অধ্যাপকগণও গবেষণা করবার জন্য প্রচুর সময় পাবেন। গবেষণা হবে অধ্যাপকদের অন্যতম কর্তব্য। মাঝে মাঝে অধ্যাপককে দীর্ঘ ছুটি দিতে হবে। সেই ছুটিতে তাঁরা বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন। নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করবেন। অধ্যাপক যদি কেবল বক্তৃতা দিতে থাকেন তবে এসব কাজ হবেনা, বস্তুতঃ রাসেলের মতে প্রত্যেক বিদ্যালয় হবে গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও পাঠশালার মত শিক্ষাদানের স্থান নয়। আমাদের মনে হয় রাসেলের মত একেবারে বর্জনীয় নহে। তাঁর মতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে যারা মনে করেন রাসেল তাদের সহিত একমত নহেন। তিনি জোর দিয়েছেন গবেষণা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষার উপর। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে ক্লাসে পড়াবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। তাতে জ্ঞানের উন্নতি সম্ভব নয়। অধ্যাপকগণ গবেষণা করবেন বেশী আর বক্তৃতা দিবেন খুব কম। রাসেলের এ মতটা খুব ভাল বলে মনে হয়। কলেজে ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের খুব দরকার। সেই দিক দিয়ে রাসেলের অভিমতের একটা সার্থকতা আছে। আমাদের দেশে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যার ফলে শিক্ষিত ছাত্রগণ জ্ঞান বিস্তারের কাজকে ত্বরান্বিত করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে সুনীতিবাবু অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'যেখানে কোনও ক্রিয়াপদ, উদ্দেশ্যের বিধেয় হইয়াও সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলে না, বাক্যটির অর্থ পুরা করিয়া দেয় না,—বাক্যটি শেষ করিতে হইলে অন্য ক্রিয়া-পদের অপেক্ষা থাকে, সেখানে তদ্রূপ ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে ; যেমন—আমি ভাত খাইয়া গাড়ী করিব ; সে চেঁচাইয়া বলিল ; তাহারা নাচিতে নাচিতে আসিতেছে ; তুমি আমার বাড়ী হইয়া যাইবে ; তুমি বলিলে আমি বলিব।'

ধাতুর উত্তর 'ইয়া' এবং 'ইলে' প্রত্যয় যোগে এই অসমাপিকা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বলেও বলেছেন। 'ইলে' প্রত্যয়ের অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বললেন, সমাপিকা ক্রিয়া কর্তা থেকে পৃথক কর্তা অসমাপিকা ক্রিয়ার হতে পারে।

'ইয়া' কর্তার অথবা ক্রিয়ার বিশেষণের মত হ'তে পারে (ধরিয়া ধরিয়া লিখ)। এর দৃষ্টান্তে ঐ রূপটি বিদ্ধ হয়। আবার সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হ'তে পারে—যেমন, 'কষিয়া বাঁধ'।

এ ছাড়া তিনি 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত পদকে মূলত ক্রিয়াদ্যোতক বিশেষণ বলেছেন, অসমাপিকা ক্রিয়াও হয়। 'ইতে' প্রত্যয় যোগ করে নিমিত্ত-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে থাকে (আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি)।

উপরের মতগুলি প্রবোধ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

সংস্কৃত ব্যাকরণে এই অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝাতে তিনটি প্রত্যয় যোগ করা হয়, ক্ত্বা-তুমুন্-তব্য। ক্ত্বা প্রত্যয়ের অর্থ হল উক্ত ক্রিয়ার কর্তা এক হলে, যে ক্রিয়াটি পূর্বকালে অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। ক্ত্বা প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

ল্যপ্—ল্যপ্ ভিন্ন অন্যের সঙ্গে সমান হলে, পূর্বকালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-বাচক ধাতুর উত্তর ল্যপ হয়।

তুমুন্—দুই ক্রিয়ার কর্তা এক হলে উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে যে ধাতু নিমিত্তার্থবোধক তাহার উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়। তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত পদ অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া।

অপভ্রংশে এই রূপ গুলি নেই। অপভ্রংশ ভাষার আদিরূপ সংস্কৃতের কোন্ রূপের সঙ্গে মেলে হেমচন্দ্র তাই-ই দেখিয়েছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে অপভ্রংশ কোন্ কোন্ স্থানে স্বতন্ত্র হেমচন্দ্র সেইটুকুই নির্দেশ করেছেন।

সংস্কৃতের ক্ত্বা অপভ্রংশে আটটি রূপের মধ্যে পাওয়া যায় : ই, ইউ, ইবি, অবি ; এপ্পি, এপ্পিণু, এবি, এবিণু।

তুম্ প্রত্যয়ের স্থানে চারটি ; এবং, অণ, অণহং, অণহি।

ইংরেজিতে Infinitive mood আছে। আসলে সেটি abstract Noun এর মতো। সংস্কৃতের গমনম্-এর মতোই an যোগ করে গঠিত হত। সংস্কৃতে গমণায়, গমনে (সম্প্রদান ও অধিকরণে) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গমিকে এই বিভক্তিরূপ লোপ পায়। উত্তর সাগর, হলস্টেইন, স্লেজউইক অঞ্চলের ভাষাতে 'অন্'-কে সংক্ষিপ্ত ক'রে 'অ'-তে দাঁড় করিয়েছে ; ডাচেরা এবং জার্মানেরা 'এন্' করে নিয়েছে।

নিমিত্ত অর্থে infinitive হতে প্রত্যয় নেয় 'এ' এবং 'to' proposition থাকে।

বাদশ শতাব্দীতে participle 'ende' এর সঙ্গে এই 'enne' বা 'anne' এর মোলমাস ঘটে যায়। 'ende' participle 'inge' হয়ে গেল।

প্রত্যয়-ing বসেছিল verbal substantive এর ung এর রূপের বদলে; বসেছিল present participle 'ende' বা inde'-এর বদলে; সময়ে সময়ে নিমিত্তার্থক infinitive enne এর বদলে। কিন্তু ইংরেজি ভাষার ঐতিহাসিকরা infinitive এর এমন ব্যাখ্যা দিতে সুরু করলেন যে, ভাষার আদি রীতির সঙ্গে তা মিলল না। ভাষার ক্রমবিকাশ নির্ণয়ে এ এক দুর্যোগ।

বর্তমানে ইংরেজিতে-'ing' দিয়ে পদগুলি পাঁচ প্রকারের হতে পারে: (১) Substantive (২) gerund (৩ present participle (৪) adjective (৫) preposition. পরিণামে দুটি ক্রিয়া-পর্যায়ের পাচ্ছি—gerund এবং present participle. জার্মানী ভাষা থেকে ইংরেজিতে present participle-এর ব্যবহার খুবই বেশি। সাধারণত stress এবং intonation দিয়ে কোনো একটা বিশেষ বিষয়কে বোঝানোর জন্য এই present participle বাক্যের কর্তার পরে বসানো হয়। Stress এবং intonation থেকে স্বতন্ত্র যে present participle তা আগে-পরেও বসানো যেতে পারে; বসানো হয় জোর দিতেই।

Stress, Intonation এর জন্যই নয় এমন স্বতন্ত্র present participle আরও কয়েকটি কাজ করে থাকে:

(১) সময় বা কালের অবস্থা, কারণ প্রভৃতির ধারণা বুঝিয়ে থাকে (walking down the street, I met a friend; having finished my work, I went for a walk)।

(২) যখন finite verb এর আগে বসে তখন finite verb এর কালের সঙ্গে এর কাল যুগপৎ; যখন পরে বসে তখন কাল সম্পর্কে কোন বিষয় নাও থাকতে পারে, যেমন,

(ক) arriving in London at ten I'll go by train

(খ) I'll go by train, arriving in London at ten

(৩) কর্তা সম্পর্কে কোন কোন সময় নির্দেশ থাকে না, যেমন: judging by the time he took over it, it must have been a difficult job।

(৪) অংশুক present participle দেখা যায়—Coming further South Asia minor is seen in the distance

অসমাপিকা ক্রিয়া নামটি সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে নিয়েছি, কিন্তু ইংরেজিতে একে বলা হয় present participle এবং তার রূপান্তর ঘটেছে Infinitive mood থেকে। Past participle কোনো কালের রূপান্তরে না গিয়ে adjective এর মতো। অপভ্রংশ ভাষাতে এই রূপটি আছে কিন্তু ব্যাকরণ থেকে তার কাজ খুব বোঝা যাচ্ছে না।

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত থেকে এলেও বাংলা ভাষা ঐ ভাষা থেকে এসেছে এমন কথা আমরা যদি স্বীকার না করি তবে বাংলার অসমাপিকা রূপ ও তার কাজ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করা যায়।

বিশ্লেষণ করতে পারি ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে। ভাষাবিজ্ঞানই আমাদের ভাষার রীতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। যে-ভাবেই হোক লোক-ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা দেয়। লোক-চরিত্র যতটা আমরা উচ্ছৃঙ্খল মনে করি অতটা হয়ত নয়। শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন অভিনবত্বের জন্য ঊর্ধ্বগামী হন, সাধারণ লোক তেমন নয়। রক্ষণশীলতার পথে থাকতে থাকতে একটা স্বাভাবিক স্রোত পেয়ে যান যখন পুরনো থেকে তাঁরা সরে আসেন।

এখন দিকের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি অসমাপিকা মূলত (১) অব্যয়, (২) ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে (৩) কর্তার অবস্থা নির্ণয় করে (৪) বাক্যে বিশেষ বলবার জায়গা গুলোতে জোর দিয়ে থাকে।

অর্থাৎ রূপের দিক দিয়ে অব্যয়, পদের দিক দিয়ে বিশেষণ।

সুনীতিবাবু 'ভাত খাইয়া গাড়ী ধরিব' বলে যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তা স্বাভাবিক অর্থে নয়। 'আগে ভাত খাইব পরে গাড়ী ধরিব' এই কথাটি প্রতিদিনকার ব্যাপার নয়। 'স্নান করে ভাত খাই' এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাংলা দেশের. ভাত খেয়ে স্নান করি' বিশেষ করে বলতে হয়। অসমাপিকা এইরূপ বিশেষ করে বলতেই ব্যবহৃত হয়। তা হলে এখানে কোনো কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এইরূপ প্রয়োগ। ইংরেজির মতো শুধু Stress বা Intonation এর জন্য এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয় নি। কিন্তু মা যদি তাঁর ছেলেকে ধমকের সুরে বলেন, 'ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাও' তবে ভাত খাওয়ার উপর ইংরেজির মতোই ঝোঁক দিলেন, অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগ করলেন।

প্রকৃত পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে অনেকগুলি ঘটন প্রক্রিয়ার একটি নাম ; নামটি ঘটনক্রিয়ার সমবায়ে যে-পরিণামটি আসে তার থেকে পাওয়া। 'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি'—এই বাক্যের 'যাচ্ছি'-র মধ্যে অনেক ঘটনক্রিয়া আছে। হাত-পায়ের মাংসপেশীর প্রবন্ধ, শরীরের বিশেষ ভঙ্গী, ঘটনক্রমের প্রক্রিয়া, গন্তব্য-স্থানের প্রতি মানসিক প্রত্যাশা। 'রাস্তা দিয়ে যাওয়া' অতি পরিচিত প্রক্রিয়া-তাকে আর ব্যাখ্যা করতে হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হলে ওরই মধ্যে কোন একটি ঘটনক্রিয়াকে বিশিষ্ট করে আনতে হয়। যেমন :

(১) যা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন

(ভানুসিংহের পত্র, রবীন্দ্রনাথ)

(২) কক্ষপ্রতিপথ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম,

(৩) প্রাণটা তার থেকে মাঝে মাঝে হেড়ে বেরিয়ে আসত।

এখন বাক্যে 'আনা'-টাই বড় কথা নয়, সেটি পরিচিত 'হিচড়ে আনা' বিশেষ করে আনা। এমনি অন্য দুটি দৃষ্টান্তেও।

মূল ক্রিয়ার এগুলি বিবরণ (descriptive)।

এই বিবরণ, ক্রিয়ার এই বিবরণ বাক্যে কত রকমে যে গতি সৃষ্টি করে যাব থেকে সাহিত্যে ধ্বনি এসে যায় তা নিচের দুটি দৃষ্টান্তের বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যাবে :

(৪) ওপারে গিয়েই মোটর গাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেছে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। (ঐ)

(৫) অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। (ঐ)

ক চিহ্নিত শব্দগুলো লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যাবে ৪ এর দৃষ্টান্তের অসমাপিকা ক্রিয়ার বিবরণ কেমন গতিশীল হয়ে ঘটনক্রমের সীমা পরিয়ে দিয়ে একটি ক্রিয়ার অবস্থার আভাস দেয়, কিন্তু ৫ নম্বরের সংযোগমূলক ক্রিয়া ঘটনক্রিয়ার সীমা নির্দেশ করে বিভিন্ন অবস্থার কথা জানিয়ে দেয়। ৪ নম্বরে আছে অপেক্ষাকৃত কর্তার মানসিক অবস্থা আর প্রস্তুতির উদ্বিগ্নতা এবং অসহায়তা ; ৫ নম্বরে আছে ঘটনক্রিয়াগুলি পরিণত হতে হতে, বিশেষ ধর্ম গ্রহণ ক'রে করে ক্রিয়াশীল হওয়া। এই সঙ্গে ৪ নম্বর বাক্যের 'গিয়েই' আর 'গিয়ে শুনি' কথাকয়টিও লক্ষ্য করতে বলছি। 'গিয়েই' বলে কাল-কে বিশেষ

রহিত যেমন করেছে তেমনি মুহূর্তটিকে অবিলম্বে আনিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু 'গিয়েছিল' শব্দটি কালের সেই তাৎক্ষণিক ভাব আনায় না, তত্টা মূর্ত হয় না ; উপরন্তু কথা দুটিতে চিন্তা এবং ঘটনার নির্ভরতা আর বৈপরীত্য বুঝিয়েছে।

অসমাপিকা ক্রিয়াকে অব্যয় হিসাবে ঘটনক্রিয়ার পারম্পর্য প্রকাশ করেও পরিণতি দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করা যায় নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে :

(৬) সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। (শ্রীকান্ত—শরৎচন্দ্র)

(৭) এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া যেজদার 'পাশের পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশত্রিশখানি টিকিটের মতো করিতেন। (ঐ)

৭ নম্বর বাক্যের 'বসিয়াই' আর ৪ নম্বরের 'গিয়েই' একই ধর্মের। কিন্তু ৬ নম্বরের 'হইয়াও' এবং 'কহিয়া' একই ধর্মের হতে পারতো কেবল প্রথমটিতে 'ও' যুক্ত হওয়ায় শেষের সমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা করল অনিবার্য ভাবে ; 'কহিয়া' একটি ব্যাপারের নাম চকিত না হয়ে স্থির হয়ে গেল, পরের সমাপিকা ক্রিয়াটির বিশেষ করে দিল মাত্র। এই সব অসমাপিকা কাল-সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিতে চায় না ; কর্তার ঘটনক্রিয়াতে অভ্যাস কালনিরপেক্ষ ভাবে। হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত কর্তার অবস্থা বোঝায়, অবস্থা অভ্যস্ত হওয়ার ক্রমের উপর নির্ভর করে। ঘটনক্রিয়া সমভাবের মধ্যে কর্তা সবসময়েই থাকে, কিন্তু সবসময়েই অভেদ থাকে না; যখন সেই থাকা এবং কর্তা অভেদ হয়ে ওঠে তখনই প্রকৃত পক্ষে অবস্থা বোঝা যায়, অভ্যাস আসে। যেমন,

(৮) সন্ধ্যার পরেই উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত (বিদ্যাসাগর)

(৯) তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত (১০) পুরান বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও, বড় ক্ষেসাতে পড়িতে হয় (ঐ)

(১১) ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ঠাকুরদাস থানা হইতে বহির্গত হইলেন (ঐ)

উপরে বাক্যগুলিতে দেখা যাবে 'হওয়া' 'থাকা' 'পড়া' ক্রিয়াগুলিতে পার্থক্য আছে। হওয়া-তে ঘটনক্রিয়ার গতিধর্ম থাকে, 'থাকা' 'পড়া' কিন্তু সেই গতিধর্ম হারিয়ে বসে। এইজন্য 'হইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার ধর্ম অনুসরণ করে সমগ্র বাক্যটির বিশেষ করে বিশেষণ; কিন্তু 'থাকা' 'পড়া' কর্তার একটি ঘটনক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ করে বিশেষণ। বিশেষণ আমি বিশেষ করার পর এবং অর্থকে মূর্ত করা অর্থে ব্যবহার করছি।

এই যে বিবরণ তা ক্রিয়াপদ নিয়েই ছবি করে তোলে, কখনও চকল কখনও স্থির আশ্রয়। যেমন

(১২) সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ স্তম্ভ হইয়া পথে পড়িয়াছে (দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর)। এই ছবিটি যেমন চকল তেমনি চকল নিচের বাক্যটি কাল-বিভক্তি নিয়ে:

(১৩) তাহাতে বনের শোভা আরও দীপ্তি পাইতেছে। (ঐ)

উল্লেখযোগ্য যে, ১২ নম্বর বাক্যের 'ভেদ করিয়া' এবং 'স্তম্ভ হইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া দুইটিতে অর্থের এবং ছবির প্রকৃতিভাব বেশ পার্থক্য ; একটিতে নির্দিষ্ট অন্যটির ঘটনক্রিয়া প্রক্রিয়া। সমাপিকা ক্রিয়ার ধর্মও দেখা যায়,

(১৪) অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

'পরে' শব্দটির জন্য 'চলিয়া' সমাপিকা ক্রিয়ার ধর্ম গ্রহণ করেছে।

এতক্ষণ আমরা ঝোঁকের জন্য, বিশেষ ঘটন-ক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য এবং কাল সম্পর্কে বিমূর্ত আভাস সৃষ্টি করবার জন্য যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার হয় তার কথা বললাম। এর

পরই বলতে হবে নিতান্ত লক্ষণ হিসাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার যে কালকে বোঝায় তার কথা।

(১৫) পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম (দেবেন্দ্রনাথ)।

(১৬) কিন্তু নব্য যাত্রী অবসন্ন বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে নিবিষেধ করিলেন (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(১৭) তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে (বঙ্কিমচন্দ্র)।

(১৮) পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কাননে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত চূড়ামণি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)।

(১৯) রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে সাবাস দিয়াছেন (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

(২০) বাপপা প্রফুল্লমুখে সেই তামার কবচ মহারাণীর হাতে এনে দিয়ে বললেন (অবনীন্দ্রনাথ)।

(২১) দেহের ঊর্ধ্বভাগ নগ্ন করিয়া বালক দাঁড়াইল। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

১৪ নং বাক্যে 'দুগ্ধ পান করা' আগে হয়েছিল, অসমাপিকা ক্রিয়া। ১৬ নম্বরে যুগপৎ অসমাপিকা আর সমাপিকা ক্রিয়ার কাল। ১৭ নম্বরে তিনটি কাল ক্রমিক, পরপর ঘটলেও দ্বিতীয় অসমাপিকাটি সমাপিকার কালে যুগপৎ। ১৮ নম্বরে আগে পরে। ১৯ নম্বরে একই অবস্থার দুটি বিবরণ, কালের তেমন প্রশ্ন নেই। ২০ নম্বরে একটি কাল বহু আগে থেকে সুরু হয়ে শেষ হতে হতে অন্যটি সুরু। ২১ নম্বরটি অবস্থা কিন্তু কাল বোঝায় নি।

প্রবন্ধটিতে আমি এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে, বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে না তেমন ক্রিয়াপদকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার বক্তার অক্ষম শব্দ প্রয়োগ বোঝায়। অথবা শব্দ বক্তা বা লেখক সহজে ব্যবহার করিতে চান না। অথবা শব্দের কোন ব্যাকরণ রীতি দেওয়া যায় না। অসমাপিকা ক্রিয়া যখন ব্যাকরণের এক বিশেষ রীতি তখন ভাষা ব্যবহারের ধর্মটিকেই সে ধরতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি তাঁর জীবনের স্মৃতি বলেই বড় তো নয়, যে কোন কবির মানসিকতা ধীরে ধীরে কেমনভাবে প্রকাশ পায় তারই ইতিহাস। জীবন-সাহিত্য হয়ে উঠেছে। সেই সাহিত্যের দিকটি তথাকথিত অসমাপিকা ক্রিয়ায় কেমনভাবে ফুটেছে ভেবে দেখা যেতে পারে:

(২২) স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।

(২৩) সে তুলি হাতে বসিয়া নাই।

(২৪) কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে।

(২৫) ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে।

(২৬) কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

(২৭) যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে।

(২৮) নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

(২৯) এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আষাঢ়ের সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

জীবনস্মৃতি থেকে খুব সামান্য দৃষ্টান্তই তুললাম। এখানে কোন্ অসমাপিকা ক্রিয়াটি বাক্যের অর্থ পুরো করে নি? বাক্যের অর্থ বর্ণনাও নয় ত্রিশূলও নয় যে নিক্ষেপ মাত্র পুরো হয়ে যায়। অর্থ লেখকের এবং পাঠকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে, অভিজ্ঞতা জাগায়। অভিজ্ঞতার কোনো এক অবস্থায় লেখক যেমন ডুবে যেতে থাকেন কিংবা

সেই অবস্থার দীর্ঘবৈচিত্র্য দেখান, পাঠকও তেমনি সেই অবস্থাকে উপলব্ধি করবার জন্য সাধারণ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে চান। বাক্য সেই অবস্থাই তৈরি করে। বাক্য সেই অবস্থাকে অনুচ্ছেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। বাক্য অনুচ্ছেদে ছবির মতো রঙের কোনো এক যোগসূত্র দিয়ে সেই অবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্রম অনুসরণে নিঃশেষ করে কোনো স্তর আঁকা হয় না। ক্রিয়ার কালের সীমা উত্তীর্ণ হতে গেলে অসমাপিকা ক্রিয়া এসে পড়ে। অসমাপিকা ক্রিয়াই একটা বিরামবিহীন কাল যোজনা করে, বক্তব্য নিঃশেষ না করে নিবিড় চিন্তার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণতা নয় অক্ষমতা নয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কালের রূপের বাঁধন থেকে সরিয়ে নেওয়ার এ এক বিশেষ ভাষাক্রিয়া। কখনও দেখা যায় বিশেষণের মতো, কখনও ক্রিয়া-বিশেষণের মতো, কখনও কালের পরম্পরা বোঝাচ্ছে বলে মনে হয়।

পৃথিবীর সমগ্র ভাষাতেই এই রীতি আছে। বাংলা ভাষাতেও আছে। কোনো ভাষারই সাধারণ ব্যাকরণ এই প্রক্রিয়াটির ঠিক সংজ্ঞা দিতে পারে নি। মোটামুটি যা কিছু দিয়েছে তাতে তাদের নিজের ভাষার সীমার মধ্যে কখনও বোঝা যায় কখনও বোঝা যায় না। অনেক ভাষায় বিশেষণেরও কাল নির্দেশ থাকে, অনেক ভাষায় থাকে না; ইংরেজির adverb আমাদের ক্রিয়াবিশেষণ নয়। সংস্কৃতের অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলার অসমাপিকা ক্রিয়াকে বোঝাতে পারে না।

যতদিন 'অসমাপিকা ক্রিয়া' নামটির সার্থক নাম দেওয়া না যাচ্ছে ততদিন আমাদের নামসম্পর্কে কিছু বলার উপায় নেই। নাম দিতে গেলে কয়েকটি দিক মনে রাখতে হয় :

অব্যয়ের মতোই এর কোন রূপপরিবর্তন হয় না; ক্রিয়াবিশেষণের মতো ব্যবহার হয় কিন্তু ক্রিয়া বিশেষণ নয় কারণ ক্রিয়ার অভ্যন্তর থেকেই একটি বিশেষ ঘটনক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে; ক্রিয়ার যা স্বাভাবিক ধর্ম সেই কাল বিভক্তি এবং পুরুষ ভেদে এর পরিবর্তন হয় না; অর্থ অসম্পূর্ণ হয় না। নতুন নামকরণের ভার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম, ক্রিয়াত্মক অব্যয়; কি ভাব-ক্রিয়া কি অন্য কোন নাম দিতে চান স্থির করুন তাঁরাই। আমি শুধু এই অনুরোধ করব অসমাপিকা ক্রিয়ার কাজগুলি জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে পঠন-পাঠন ব্যবহার যেন তাঁরা করেন।

১

২

আত্ম-সমীক্ষা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ছেলেরা আবার বাগানে বাঁশ কাটতে এলো। দু'খানা সোজা বাঁশের দরকার। গোলপোটের জন্ত লাগবে। আমি তাদের সঙ্গে বাগানে গেলাম। বাঁশ বাছাই হোলো। একটা দাবে কোনরকমে কাজ হোলো। আর একখানা এত ছোট যে বাঁশ কাটা যায় না। ওরকম দা দিয়ে বাঁশ কাটতে যাওয়া এবং গাদা বন্দুক নিয়ে হাতী শীর পাশ দখল করতে সাহসী হওয়া একই রকমের মূঢ়তা। কলেজের ছেলেরা নিশ্চয়ই বালখিল্য ঋষি নয়।

আমার মনে হয়েছে, যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার হালে আছেন তাঁরা মনে প্রাণে শিক্ষাব্রতী নন। বুনিয়াদী শিক্ষার উপর থিসিস্ লিখে ডিগ্রোমা পাওয়া আর ঐ শিক্ষায় বিপুল সম্ভাব্যতায় সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করা ঠিক এক জিনিষ নয়। আসলে যাঁদের উপর এই সব প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষায় শ্রদ্ধাবান নয়। কর্মে বিশ্বাস থাকলে হাতিয়ারের চেহারা এমন কাহিল হ'তে পারতো না।

ছাত্র-শিক্ষক—সকলের মধ্যে একটা শিথিলতা দেখতে পাচ্ছি। খেলার মাঠে বসে আছি। বৃষ্টি পড়লো গোলপোটের ধারে। নতুন বাঁশ লাগানো হয়েছে, কিন্তু এঁকো কাটা হয়নি। বল্ ওখানে লাগলেই কেটে যাবে। খেলা বন্ধ থাকবে। কলেজের আর্থিক ক্ষতিও বটে। আমি ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তারা ইতিমধ্যে ভুল সংশোধন করেছে। আর একটা দৃষ্টান্ত। রাস্তা থেকে নেমেই কলেজ কম্পাউণ্ডে একটা ছোট মণ্ডপ আছে। বৃষ্টি থেকে অথবা রৌদ্র থেকে পরিত্রাণের আশ্রয়। মণ্ডপ গোলাকৃতি জায়গাটা পাকা। খুঁটি বাঁশের। উপরে খড়ের ছাউনি। কি রকম মজবুত্ হয়েছে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, খুঁটিগুলি নড়ছে। পোঁতা ও গাদা দুই-ই ভালো হয় নি। মনে দুঃখ হোলো। একজন অধ্যাপককে চিঠিতে জানালাম:

দেখিলাম ওয়াজের বাঁধা গোলঘর।
দাঁত করে নড়্বড়্ যেন বুড়ো নর॥

খুঁটিগুলি সেই অবস্থাতেই আছে। ওয়াজ ফকীর স্থানীয় দরামি। খুঁটির বাঁশগুলি এক এক জন অষ্টাবক্র ঋষি। সুন্দরের প্রতি অনুরাগকে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের শিকেয় তুলে রেখেছি। সৌন্দর্যতত্ত্ব কলেজের ছাদের জন্ত যেন প্রতিদিনের জীবনের জন্ত নয়। আমাদের শিক্ষা, আমাদের জীবন-দর্শন যেন আচরণের জন্ত নয়। ওগুলো মগজের বৌদ্ধিক তত্ত্ব হয়ে আছে, মর্মমূলে যায় নি, হৃদয়ের জীবন্ত অনুভূতির আগুনে রাঙা হ'য়ে ওঠে নি। খ্রীষ্টের বাণীতে আছে: If you keep my word you shall know the truth and the truth shall make you free. কতকাল আগে নাজারেথের এক তরুণ সূত্রধরের কণ্ঠে এই বাণী ধ্বনিত হয়েছিল—কিন্তু পুরানো হ'লেও চিরনবীন। মানবজীবনে যা সত্য তা আমরা ঠিক মতো উপলব্ধি করি তখনই যখন আচরণে অনুসরণ করে প্রমাণ পাই, তা মিথ্যা নয়। জীবন্ত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই সত্যকে আমরা সত্য বলে নিঃসংশয়ে জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ সম্পর্কে এমন সংবাদ নজরে পড়ে যাতে দোষ তাদেরই ব'লে মনে হয়। কিন্তু

তাই কি? তাদের আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে কি কি কারণ রয়েছে, সেগুলিকে তলিয়ে বুঝবার দিন এসেছে। একটা এলো-মেলো নৈতিক নেতিবাদের সূত্রের বিষাক্ত আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছে তারা। যাকে বলে moral nihilism—এ যুগ হচ্ছে সেই কিছু-না-মানার আত্মকেন্দ্রিকতার তমসাচ্ছন্ন যুগ। প্রতি মুহূর্তের বুক থেকে আনন্দ লুটে নিতে হবে। অর্থ, ক্ষমতা, আত্মসুখ-এরাই শাসন করছে বল্গাহীন যুগ-অশ্বকে। সংস্কৃতির মানে বদলে গেছে। অর্থ দাঁড়িয়েছে—Sweetness নয়, light নয়,—cash, power and pleasure. স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন: Have faith in man whether he appears to be an angel or the very devil himself. মানুষকে স্বর্গের দেবতা অথবা শয়তান যাই মনে হোক, তাতে বিশ্বাস রাখো। আবার বলেছেন, "কোন মানুষ যদি মিথ্যার দিকে আগিয়ে যায় বুঝতে হবে, সে এমন করছে সত্য পাচ্ছে না ব'লে। সুতরাং যা মানুষকে সংশোধন করবার একমাত্র পথ তাকে সত্য দেওয়া।"

ছাত্রেরাও মানুষ। তাদের মধ্যেও আত্মার আলোর শিখা জ্বলছে। মাটির নীচেও পিত হোলে আলাদা কথা ছিলো। দেয়াল, পাথর—এরা মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু দেয়াল আর পাথরই থেকে যায়। দস্যু রত্নাকরের ডাকাতের বাঁশি কিন্তু কখন্ মহাকবির বাঁশি হ'য়ে বেজে ওঠে। চণ্ডাশোক কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে ধর্মাশোকের রূপান্তরিত মন নিয়ে। সুতরাং বিবেকানন্দের ভাষায় Have faith in man first. মানুষে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা রাখো।

সক্রেটিস্ যেখানে আছে সেখানে প্লেটো তৈরী হয়। প্লেটো তৈরীর মাল-মসলা ছাত্রদের মধ্যে এখনো আছে। তারা তো আজও মানুষই আছে। মানুষের আত্মায় আজও সুন্দরের প্রতি মজ্জাগত অনুরাগ, অজানাকে জানবার দুর্বার পিপাসা, অসীমের জন্য বিপুল ক্ষুধা। তার মধ্যে যদি শুধু প্রেয়ঃ থাকতো, তবে স্বামীজী কখনোই এমন জোরের সঙ্গে মানুষের উপরে বিশ্বাস রাখার কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে শ্রেয়ঃ রয়েছে প্রেয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। তার দেহের রক্ত মাংসের খাঁচার মধ্যে অসীমের পানে ব্যগ্র দুটি বাহু প্রসারণের ব্যাকুলতা রয়েছে।

অধ্যাপকদের ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। যা জীবনের পবিত্র ব্রত হওয়া উচিত ছিল তা অর্থ উপার্জনের বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য না পেয়ে ছাত্রেরা তাই মিথ্যার দিকে ছুটেছে। কিন্তু এসব কথা লিখলাম বিচারকের উন্নত ভূমিকা নিয়ে নয়। আমার স্থানও তো আসামীর কাঠগড়ায়। এ প্রবন্ধ শুধু thinking aloud.

॥ মহাজীবনের পুণ্যালোকে ॥

(ছাত্রজীবন)

কানাইলাল বসু

গান্ধীজীর শৈশবকালটা অতিবাহিত হয়। এইখানে অনাড়ম্বরে প্রচলিত দেশীয় রীতিতে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। আজিকার জগদ্বিখ্যাত গান্ধীজী শৈশবে একান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি আত্মজীবনীতে এ কথা বারবার অকপটে বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম স্কুল সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতি মলিন। সামান্য দুই একটা কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "...আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিলনা এবং স্মরণশক্তিও কাঁচা ছিল।" সমগ্র ছাত্রজীবনে গান্ধীজীর অসামান্য প্রতিভার অনুভবগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটে নাই —এ কথা ক্রমে ক্রমে আমরা জানিতে পারিব।

গান্ধীজী বিদ্যার্জনের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই পোরবন্দর হইতে পিতার নিকট রাজকোটে আসেন এবং সেই স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আর বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই দুইটি বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল গান্ধী জীবনের ভিত্তি রচনার সময়। পরবর্তীকালের সত্যসন্ধ গান্ধী চরিত্রের বনিয়াদ এইখানেই গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ ঘটনার মধ্যে গান্ধী জীবন ও চরিত্রের বিকাশ ধারাটিও আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণ ছাত্রের মত নানা দোষ থাকিতে পারে গান্ধী চরিত্রে তাহা কমবেশি দৃষ্ট হইত। ইহার মধ্যে গান্ধীজীর যে বিশিষ্টতা তাহাও পাঠকের দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে।

স্কুল জীবনে গান্ধীজীর আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। ঠাট্টা বিদ্রূপকে তিনি ভয় করিতেন এবং সচেতনভাবে এড়াইয়া চলার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতেন। ভ্রষ্টা-ভক্তির ব্যাপারে গান্ধীজীর এই সময়কার আচরণ অনেকটা বাড়াবাড়ি ছিল। বয়স ও সম্পর্কানুসারে যাহার যেমন ভ্রষ্টা পাইবার কথা তাহাকে তাহাই দিতেন; গুণাগুণ বিচার করিতেন না। যাহাকে ভ্রষ্টা করিবার কথা তাহার আচার আচরণের ত্রুটি বা ব্যবহার বৈগুণ্যের জন্য তিনি তাহাকে কখন অভ্রষ্টা করেন নাই। আত্ম জীবনীর "কেটলি বানানের" আখ্যানটি কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া আজ অপেক্ষাকৃত বহুবিদিত। ঘটনাটি বিশেষ অর্থব্যাঞ্জক এবং গান্ধী-জীবন-বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব প্রকাশ দ্বারা শ্রীমণ্ডিত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"হাই স্কুলের প্রথম বৎসরেই পরীক্ষার সময় একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জাইলস্ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পাঁচ ছয়টা শব্দের বানান লিখিতে দিলেন। এই শব্দগুলির মধ্যে একটা শব্দ ছিল কেটলি (Kettle)। তাহার বানান আমি ভুল লিখি। মাষ্টার মহাশয় জুতার ডগা দিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। ...আমি ইহা বলিতেই পারি নাই যে, মাষ্টার মহাশয় আমাকে পাশের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া বানান শুদ্ধ করিতে বলিতেছেন।...সমস্ত ছেলেই ঠিক বানান করিল, আমি একাই বোকা বনিয়া গেলাম।...আমি অপর ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে কখনও শিখি নাই।

তাহা হইলেও এ ঘটনায় মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয় নাই। গুরুজনদের দোষ না ধরার গুণ ছিল আমার ভিতর সহজ ও স্বাভাবিক। এই মাষ্টার মহাশয়ের অনেক দোষ পরে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমানই ছিল। গুরুজনদের আজ্ঞা পালন করিব; এতটুকুই আমি জানিতাম।"

আজকালকার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতী গান্ধীজীর এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। তাহারা নিজেদের ধ্যানধারণা অনুসারে যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করেন, এই রকম একটা ভাব দেখান। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের মনে অলক্ষ্যে সত্য অসত্য ভালমন্দের একটি আত্মবাদী ধারণা সৃষ্টি হয়। সেই ধারণার আলোকে তাহারা সব কিছু বিচার করেন। সুতরাং সেই বিচারে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা স্বার্থ-পরতারই নামান্তর মাত্র। ঐ বিচারের মানদণ্ড নিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই মানদণ্ড হইতেছে বোধ। যুগে যুগে সমাজের ব্যবধানে যেমন ইহা বদলায় তেমনি ইহা দেশে দেশে পৃথক; মানুষের গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে ভিন্ন—তা সে রাজনৈতিক গোষ্ঠি হোক বা ধর্মীয় গোষ্ঠি হোক অথবা অন্য কিছু হোক। অতি সাধারণ ছাত্র গান্ধীজী যে, পরবর্তী জীবনে অতীব অসাধারণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে তাঁহার এই নির্বিচার শ্রদ্ধা অনেকখানি রস ও রসদ যোগাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহার ফলে বর্তমান সমাজের বিচারে শ্রদ্ধা যাহার প্রাপ্য নহে এমন কোন কোন লোক হয়তো শ্রদ্ধা পাইয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার আসনটিতে যাহাদের তাহা অধিকার তাহারাও বঞ্চিত হন নাই। অন্যকে শ্রদ্ধা না জানাইবার মূঢ়তা হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই তো প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রদ্ধা মুক্ত চিত্তের অধিকারী না হইলে যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। শিক্ষা কেবল যে আমরা শিক্ষকের নিকট হইতেই পাই তাহা নহে। তাপক্য শ্লোকে আছে—

সিংহাদেকং বকাদেকং শট তণস্ত্রীনি গর্দভাৎ
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেতচত্বারি কুক্কুটাদপি।

সিংহ বক কুক্কুর গর্দভ যোরগ ইহারা সামান্য প্রাণীমাত্র। মানুষ ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করে না। ইহাদের নিকট হইতে কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহা শ্রদ্ধা সহকারে না লক্ষ্য করিলে কি জানা যায়? ভারতীয় ঋষির ধ্যানলব্ধ জ্ঞান-'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' গান্ধীজির জীবনে ছাত্রজীবনে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

পরিবেশের প্রভাব গান্ধীজির চিত্তে শ্রদ্ধা ভক্তির গুণটিকে উচ্চস্তরে করিয়াছিল। একটি নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ভারতীয় হিন্দুর মত গান্ধীজির পিতামাতাও কেবলমাত্র স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম চর্চার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহারা "...হাবেলী (বিষ্ণু মন্দির) যাইতেন, শিবালয়ে যাইতেন, রাম মন্দিরে যাইতেন।" পুত্রগণও তাঁহাদের সঙ্গী হইতেন। সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীহীন ভক্তির এই নির্মল পরিমণ্ডল গান্ধীজির জীবনকে ছাত্রজীবন হইতেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আর গান্ধীজি তো স্বীকার করিয়াছেন—"বাল্যকালের সংস্কার-ভাল হউক আর অন্যই হোক, মনের ভিতর খুব গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়।"

স্কুল জীবনে পাঠ্যাতিরিক্ত পড়াশুনার প্রতি গান্ধীজির কোন অনুরাগ ছিল না। তাঁহার পিতৃদেব 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক একখানি নাটক আনেন। গান্ধীজি বইখানির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পাঠ করেন। পিতা মাতার প্রতি শ্রবণের ঐকান্তিক ভক্তি তাহাকে মুগ্ধ করে। তিনিও পিতামাতার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। এই বইখানি পড়িয়া শ্রবণের মত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধীজী পিতা মাতার সাহচর্য দীর্ঘকাল পান নাই। দেশে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ

হয় এবং বিলাতে প্রবাসকালে মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। পরবর্তীকালে কয়েকখানি পুস্তক মহাত্মাজীর জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার অনেকগুলির দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক মতামত ও সাংগঠনিক কার্যকর্ম বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজির চরিত্র গঠনে এই প্রবন্ধের পিতৃভক্তি নাটকখানির প্রভাব বোধ হয় যথার্থভাবে নির্ণয় সম্ভব নহে।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। ভারতের হিন্দুমাত্রেই গল্পটি মোটামুটি জানেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যপাট স্ত্রী-পুত্র সবই হারাইয়া শ্মশানে ডোমের কাজ স্বীকার করিয়াছেন তথাপি সত্য ভ্রষ্ট হন নাই। এই উপাখ্যান পড়িবার সময় চক্ষু দুটি সজল হয় না এমন পাঠক নাই বলিলেই চলে। গান্ধীজি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের অভিনয় দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী সকলে কেন হয় না?" সেই সময় হইতেই তাঁহার মনে জাগ্রত হইল: "হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় স্বপ্নে পড়িয়া তাহারই ন্যায় সত্য পালন করিব।" স্কুলের সাধারণ ছাত্র গান্ধীজির পরবর্তী জীবনে বীর্যের-সত্যের-শুভের প্রকাশ ঘটে আর তাহার কারণও বহুলাংশে এইভাবে গঠিত হইয়াছে।

গান্ধীজি যে একান্ত সাধারণ স্তরের ছাত্র ছিলেন, জীবনের কোন দিকেই তাঁহার এমন কোন বিশেষত্ব দেখা যায় নাই যাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। অপর দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য হইলেও নানা দুষ্প্রবৃত্তির তিনি শিকার হন। বলে পড়িয়া, দুষ্ট বন্ধুর প্রভাবে তিনি বিড়ি খাওয়া, চাকরের পয়সা চুরি করিয়া বিড়ি কেনা, নিরামিষাশী বৈষ্ণব হইয়াও মাংসাহার, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতি বিবিধ অপরাধ করেন। প্রস্তুত হইয়া দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার জাগ্রত হৃদয়, পিতা-মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, এবং সত্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহাকে সর্বদাই অনুতাপে বিদ্ধ করিয়া রাখিত। আত্মজীবনীতে তিনি ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁর অন্যায় সকল কর্মকেই সকলেই আমরা একটি নীতি ও কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসুক। অন্যায় ও অসত্য কর্মকে নীতির মোড়ক পরাইতে কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজি ছাত্র জীবনের এই সকল 'অপরাধ' তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের দ্বারা কল্যাণকর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী মনের নিকট কুযুক্তি টেঁকে না। তাই গান্ধীজি একদিন একখানি পত্রে অকপটে সর্ববিধ অপরাধ স্বীকার করিয়া পিতার নিকট শাস্তি প্রার্থনা করেন। গান্ধীজি এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তিনি লিখিতেছেন—"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের দোষ, যাঁহার শোনার অধিকার আছে তাঁহার নিকট খুলিয়া বলে ও আর না করার প্রতিজ্ঞা করে, সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে।" সাধারণ মানুষ এইভাবেই অসাধারণ হন। আমার মনে হয় যে গান্ধী-পথের অপূর্ব বিকাশের দ্বারা পুরাতন ধরণীও নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহার সূচনা ছাত্র জীবনের এই ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজি এই সময় মনের যোল বৎসর বয়সের কিশোর মাত্র।

অনেক কঠিন সংগ্রামের বিজয়ী ও দুঃসাহসী নায়ক গান্ধীজি ছাত্রজীবনে ভীরু ছিলেন। কথাটা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। তথাপি ইহা সত্য। গান্ধীজি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন "...আমি ভীরু ছিলাম। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, আমাকে পাইয়া বসিত।...রাত্রে কোথাও একলা যাওয়ার সাহস আমার ছিল না।...রাত্রি না আসাইয়া শোওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।"—ভীরু ভীতু ছেলেটি পরবর্তী জীবনে কিসের জোরে এমন নির্ভয় হন যে ইংরেজের বন্দুকগোলার সামনে নিরস্ত্র হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ভগবদ্বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত ও নৈতিক

বলে বলীয়ান না হইলে কোন মানুষের পক্ষেই এবম্বিধ দুঃসাহসিক আচরণ করা সম্ভব নহে। ভগবদ্বিশ্বাস রূপ অমোঘ শক্তি তিনি সহজ ও সাবলীলভাবে লাভ করেন দাই রম্ভা মাইয়ের নিকট হইতে। গান্ধীজি লিখিতেছেন—"রম্ভা আমাকে বুঝাইত যে রাম নাম উহার (ভূতের) ঔষধ। বাল্যকালে ভূতপ্রেতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য রাম নাম জপ করি।...রাম নাম জপ আমার কাছে অমোঘ শক্তি।" উক্তিটি আমাদের গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় বিখ্যাত রামধুন সঙ্গীতের কথা মনে করাইয়া দেয়। গভীর বেদনার সঙ্গে আরো স্মরণে আসে ৩৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি বুলেটবিদ্ধ গান্ধীজির শেষ উক্তি "হা রাম! হা রাম!!" এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে, বালক বয়সে মহারাজা বিশ্বেশ্বর প্রসাদের রামায়ণ গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এই ঘটনাটি আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"আজও আমি তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত মানুষ চিরকালই ভয় হীন। ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাসের জন্য যুগে যুগে প্রহ্লাদের ন্যায় বহু মানুষ সহাস্যে সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। আমাদের জীবনকালে আমরাও গান্ধীজির মধ্যে তেমনি একজনকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

ঘটনাটি হইতে ভগবানে শিথিল বিশ্বাসী আমরা সাধারণ মানুষ এই আশা করিতে পারি যে, বাল্যকালে ভীরুতা বা ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। গান্ধী মহাজীবনের পুণ্যালোকে এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বালক বয়সে, স্কুল জীবনে যাহারা ভীরু, যাহাদের আচার ব্যবহারে বিবিধ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, যা কাজকর্মে প্রতিভার তিলেক স্পর্শও লক্ষিত হয় না তাহারাও আদর্শ নিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী ও ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া যদি কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। লোকশিক্ষার জন্য, সাধারণ মানুষের প্রাণে আশা ও আস্থা সঞ্চারের জন্য মনে হয় গান্ধী মহাজীবন এমন একান্ত সাধারণ ভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শৈশব ও কৈশোরে বিকশিত হইয়াছে।

ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজির মানসিক বিবর্তনের এই পর্যায়ে আরও দুই তিনখানি বই খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাগ্রে মনুসংহিতার নাম করিতে হয়। "এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার নীতি যাহারই সমাবেশ সত্যে রহিয়াছে" —এই মহৎ ভাব তাঁহার চিত্তে মুদ্রিত হয় ঐ পুস্তক পাঠে। এই সময় হইতে তিনি সত্যাগ্রহও হইয়া উঠেন।

শ্যামল ভট্টর নীতি কবিতার মধ্যে গান্ধীজি যেন তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট পথের সন্ধান পাইলেন। আত্মজীবনীতে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন গান্ধী মানস উপলব্ধির জন্য তাহার মূল্য অপরিসীম বলিয়া এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল।

"পান করিবার জল যদি পাও,
অন্ন করিও দান,
মিষ্টি কথাটি ভাগ্যে জুটিলে
মাটিতে লোটাইও শির,
কড়ির বদলে দান করে যেও,
তুমি মোহরের প্রাণ
পরাণ বাঁচালে—জীবন দিবার
দুঃখ করিও নীর।
জ্ঞানী যারা—করে কথা ও কাজের
এমন করেই মিল,
যে কোন ক্ষুদ্র সেবার তাহারা
দশ গুণ নেয় ফিরে।
সকল মানুষ এক বলে জানে,
মহৎজনের দিল,
অপকার যারা করে তাদেরও
উপকারে রাখে ঘিরে।

ইহা ভিন্ন ঐ বয়সেই তিনি পণ্ডিত প্রবর মদন-মোহন মালব্যজীর ভাগবত পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

একজন সত্যিকারের বিদগ্ধ মানুষের নিকট হইতে ভাগবত শুনিবার সুযোগ এখন সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখনকার ছাত্র যুবকেরা বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ভাগবত পাঠ শ্রবণের দ্বারা সত্যই কি কি পাওয়া যায়। যাই হোক এই রকম অবস্থার মধ্যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় উনিশ বৎসর বয়সে গান্ধীজি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভাবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। (ক্রমশঃ)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সমস্যা

অতীজন মিত্র

বাংলাদেশে শিক্ষকের কাজ করিবার জন্য একদময়ে শিক্ষকের একান্ত অভাব পড়িয়াছিল।

এখন শিক্ষকের সংখ্যা বড় কম নহে—কিন্তু শিক্ষক সমস্যা পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছে।

এখন দলে দলে যুবকেরা—শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক—কিন্তু শিক্ষকতার "ব্রত" গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

শিক্ষকগণের বিভিন্ন সংগঠন যত আন্দোলনই করুন, শিক্ষকগণ আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা এই উত্তরই বোধ হয় পাইবেন যে, তাহাদের বর্তমান নির্ধারিত বেতনের হার একটি শুচিস্নাত পরিবেশের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য নহে। বর্তমান যুগে শিক্ষকগণের আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে তাঁহারা আর বেতনের "স্কেল" লইয়া 'উত্তত দণ্ড' নহেন, তবে তাঁহারা চাহেন এ "বেতনের" নিয়মিত প্রাপ্তি হউক এবং সকল সরকারি কর্মচারিদের মতই তাঁহারা মাসের প্রথম দিকেই বেতন পান।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকগণ অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বাস করেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রার মানও এমন ব্যয় বহুল নহে। তাঁহাদের যাহা বেতনের হার, তাহা নিয়মিত পাইলেই বোধ হয় "শান্তম্" আসিবে।

আসিবে কি?

শিক্ষক এখন আর বর্ণপরিচয় বা পুস্তকের প্রথম কিস্তার শিক্ষক থাকিতে প্রস্তুত নহেন।

তিনি চাহিতেছেন সমাজের স্বীকৃতি, তিনি চাহিতেছেন রাজনীতির স্বীকৃতি, তিনি চাহিতেছেন মন্ত্রীপরিষদের সভ্য হইবেন। "জ্ঞানাৎ পরতরো" কথা আজ বিস্মৃত বাক্য। শিক্ষক যদি জ্ঞানদান ব্রত গ্রহণ করেন, তবে তো তাঁহাকে জ্ঞান-আহরণ ব্রতও প্রতিদিনের ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষক সমাজ কি আজ এই দিক আদৌ ভাবিতেছেন? লেখকের মনে আছে প্রায় পঞ্চাশ-বৎসর পূর্বে একজন গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের সম্বন্ধে—তাঁহার গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তিনি যে "প্রেসিডেন্টগিরি" করেন, তিনি নিজে জ্ঞানার্জন করেন কখন এবং ছাত্রদের অনন্যমনা হইয়া জ্ঞানদান করিবার সুযোগই বা পান কোথায়?

স্বভাবতঃ প্রশ্ন আসিবে জীবন যাত্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ—সবাইকে সকল কাজই করিতে হইবে। কথাটা খুবই ঠিক—কিন্তু শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও কি তাহা প্রযুজ্য? শিক্ষকগণ স্ব স্ব অন্তরে প্রশ্ন করিলেই এর উত্তর পাইবেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিবার পর শিক্ষক তথা শিক্ষিকাগণ আত্মানুশীলনের কতটুকু চেষ্টা করেন? যিনি প্রতিদিন জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় করিতে না পারিলেন, তিনি কি শিক্ষা দিবেন? এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন আসে—শিক্ষকগণ কি আজ 'হবিষান্নকবর্ত্ম' এর পথ অনুসরণ করিতেছেন? সহরে এক একজন শিক্ষকের 'চা', সিগারেট. রেস্তরা, পোষাক, তাম্বুল প্রভৃতির পশ্চাতে মাসে কত টাকা খরচ হয় তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করিবেন না। শিক্ষকের পক্ষে নয়াই টাকার একটি "সুট" কি একান্তই প্রয়োজনীয়? শিক্ষক কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ছাত্রকেও বিলাসী করিয়া

ভুলিতেছেন না? পল্লী অঞ্চলের শিক্ষক কি 'চাষের জমির' মাত্রা বৃদ্ধি করে ভুলিতেছেন না?

শিক্ষক সমস্যার সবচেয়ে প্রধান বিষয়ই এই বোধ হয় যে শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আজ আদর্শচ্যুত। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ অনেকেই নিশ্চয়ই শিক্ষকগণের এই কথা অকপটে স্বীকার করিবেন যে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মধ্যেই দুইটি দল বিদ্যমান। অহরহ ও মাৎসর্য বিষ শিক্ষকগণের মধ্যে ঘুণের কাজ করিতেছে। 'ঘুন' কথাটি প্রয়োগ করা হইল এই অর্থে যে ধীরে ধীরে শিক্ষকবৃন্দ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন—দেহে নহে মানসিকতায়। এই কথা শিক্ষকগণ কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত রোগী সহজে তাহার দেহে বিষ বাসা বাঁধিয়াছে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাংলাদেশের অনেক বিদ্যালয়ে আজ গোলমাল চলিতেছে। ইহার পশ্চাতে শিক্ষকগণ রহিয়াছেন। বিদ্যালয়ের খরচের হিসাব পত্র, বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ত্রুটি বিচ্যুতি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কলহ—বাহিরের 'শ্যাম' বাবু বা শ্যামবাবুর জানিবার কথা নহে—যদি শিক্ষকগণ নিজেরাই কতখানি সৎ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাহিরের চেষ্টা নিনাদে অবতীর্ণ না হ'ন। বেনামী চিঠি, বেনামী প্রাচীর পত্র এসব ব্যাধি পূর্বে শিক্ষক সমাজে ছিল কি?

শিক্ষকগণের মধ্যে আজ কত আপত্তি উঠিয়াছে। তাঁহারা একাদিক্রমে চার পিরিয়ড ঘুনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আজ ক্লাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা দৈনিক পাঁচ পিরিয়ডের বেশী ক্লাস করিবেন না, প্রত্যেকটি পিরিয়ডে শ্রেণী বদল করিবার জন্য অন্ততঃ দশ মিনিট সময় ছুটি দিতে হইবে নতুবা কণ্ঠনালি শুষ্ক হইয়া আসে, মৌতাত না হইলে শ্রেণীতে পড়ান ভাল হয় না। কেবল কি তাহাই? তাঁহারা যত ইচ্ছা প্রাইভেট পড়াম না, তাঁহাদের ছাত্রদের খাতা যাচাইয়ের সময়ে অন্তত সংশোধন করিয়া দিব না, স্কুলের ছাত্রদের খাতা দেখিবার সময়ের অভাব হইবেই। আর বেশী ভাল করিয়া পড়াইলেই তো আর বাড়ীতে টুইশানের দরকার হয় না। অতএব। আয়ের পথও সুগম রাখা প্রয়োজন।

তবুও আমাদের বিদ্যালয়গুলি চলিয়াছিল, চলিয়াছে এবং চলিতে থাকিবে! কিসের বলে? এখনও একদল বুদ্ধিহীন শিক্ষকের দল আছেন যাহারা সত্যই শিক্ষাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের পুণ্যেই এখনও শিক্ষাজগৎ চলিতেছে।

কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা চলিবে কি?

শিক্ষাজগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে প্রাচীনকাল হইতেই শিক্ষকগণ সমাজকে আদর্শ দিয়া আসিয়াছেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনেও শিক্ষকগণই ছাত্রগণকে প্রেরণা যোগাইয়াছেন, তাহাদের সম্মুখে ত্যাগ, স্বদেশপ্রেম ও নিষ্ঠার জলন্ত দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন। এক একজন 'মাষ্টারদা' অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন,

ভাষার শক্তি ও আত্মশক্তি

কিতীন্দ্রকুমার নাগ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীর স্বপক্ষে ইংরেজী অপরিহার্য বলিয়া রবীন্দ্রনাথের উক্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেত্রবিশেষেই ঐ অপরিহার্যতার কথা বলিয়া থাকিবেন। নতুবা তিনি একবার বলিতেন না: ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় হইতেছে না? গান্ধীজীও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "যাহাদের শিখিবার ক্ষমতা আছে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বহু করিয়া ইংরেজী ভাষা শিখিতে বলিব এবং ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ জাতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিব।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবহিতপূর্বে প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে (১৯৬০-৬১) প্রকাশ পাইয়াছে যে ইংরেজী ও মাতৃভাষা (প্রধানতঃ বাংলা) নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের বৃহত্তম বিভীষিকা হইয়া রহিয়াছে। মাতৃভাষায় ভাবগ্রহণ ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যাহারা অর্জন করিতে পারিল না, বিদেশী ভাষায় ভাবগ্রহণ ও প্রকাশই বা তাহারা করিবে কি করিয়া?

তদুপরি, সরকারী কার্যকলাপেও মাতৃভাষা ব্যবহারে গরমেচ্ছ ভাব। তাই অনেকেরই মাতৃভাষা সাগ্রহে শিখিবার তেমন গরজ নাই। বরং পদ-মর্যাদা, বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য দুর্লভ সুখ-সুবিধার লোভে তাহারা নানাভাবে ইংরেজী রপ্ত করিবার জন্য উৎসুক। তাহা ছাড়া কারেমী স্বার্থতো আছেই—সরকারী কর্মচারী ও নির্বাচিত পদাধিকারীদের মধ্যে যাহারা বয়স্ক (৪০ কি ৪৫ বৎসর বয়স বা তাহার অধিক) তাহারা নূতন ভাষা অবলম্বন করার অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তবু, সুনীতিবাবু জোর দিয়া বলিয়াছেন যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা সকল ছাত্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষাকে অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে রাখিয়া ইংরেজ সরকার প্রায় দুইশত বৎসরের চেষ্টায় এদেশে শতকরা দুই জনকেও ইংরাজী শিখাইতে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় ইংরেজী ভাষার চিরস্থায়ী ও মৌরুসী হইয়া থাকার বন্দোবস্ত করার অর্থ কি এদেশ বাসীকে পূর্ণমাত্রায় পঙ্গু করারই নামান্তর হইবে না? এই বিষয়ে গান্ধীজী সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন: বিদেশী ভাষার সাহায্যে প্রদত্ত শিক্ষা জাতীয় শক্তি শুষিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্রগণের আয়ু কমিয়া গিয়াছে এবং তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

ইংরেজী নির্ভরতার ফলে আমাদের শিক্ষার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পুনঃ পুনঃ আমাদের সতর্ক করিয়াছেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আগেকার এক সমাবর্তন ভাষণে (১৯৬২) বলিয়াছিলেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূর্বে মাতৃ ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের নীতি ঘোষণা করিলে এই প্রাচীন দেশে নূতন যুগের অভ্যুদয়ের কম আরও পূর্বেই সার্থকতা লাভ করিত।

সুনীতিবাবু ত্রিস্তাসাসূত্র প্রসঙ্গে হিন্দীকে অহিন্দী ভাষীদের উপর চাপাইয়া দিবার মতলব বলিয়া তাঁহার মতের যে পুনরুক্তি করিয়াছেন তাহা হিন্দীভাষী ও অহিন্দীভাষী বলিয়া জাতিভেদের নামে অহেতুক তিক্ততা সৃষ্টির ইঙ্গিত স্বরূপ। ইহা এদেশের পক্ষে মারাত্মক ছেলেভুলী। অথচ মাতৃ ভাষার উৎকর্ষ সাধন আমাদের সকলেরই কাম্য এবং উহা সংবিধান সম্মতও। ইহাতে কোথাও কোন বিরোধের প্রশ্ন নাই। যাহা হউক, হিন্দি প্রচলন সরকারী চেষ্টার ফল না হইয়াছে প্রয়োজনের তাগিদেই তার বেশী হইয়াছে, নিঃসন্দেহেই বলা যায়। জনসাধারণের সংস্পর্শে আসার জন্য সমগ্র দেশ সফরে গান্ধীজী দেশের কথা, দেশের নিজস্ব ভাষায় বলার জন্য হিন্দুস্থানীকেই সর্বোপযোগী বাহন বলিয়া গ্রহণ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বিপ্লব শুরু হয় ১৯২০-২১ সালে। বিনোবাজীও ভারত পর্যটনে সর্বত্র মার্জালাপ ও বক্তৃতা হিন্দীতেই করেন। তাঁহাদের কাহারও মাতৃভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী নয়। এক শতাব্দীর পূর্বের কথা, বাঙ্গালা দেশেই রামমোহন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেন ভারতবাসীকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য একটি সাধারণ ভাষার কথা অনুধাবন করিয়া হিন্দীর অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দী প্রতিরোধের নামেই যেন ইংরেজীর প্রাধান্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য ইংরেজী অনুরাগীরা শশব্যস্ত অথচ মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই অনেকটা যেন নিজের নাক কাটিয়া অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করারই সামিল। ইহা নিজেদের উপর বিশ্বাসের অভাবই সূচনা করে নাকি? অথচ, রাজনৈতিক পরাজয়ের ফলেই ইংরেজী আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল এবং পরাভবসুলভ মনোবৃত্তি দ্বারাই উহা পুষ্টিত হইয়াছিল। এই দাসত্ব বহুবৎসর ধরিয়া আমাদের কোটি কোটি মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছে এবং ইহার জন্য আমাদের ভাষা দায়িত্বশীল সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এই যে ইহার জন্য আমরা লজ্জা অনুভব করিনা বা অনুতাপ করিনা।

ইংরেজীর কল্যাণে যে ঐক্যের দোহাই দেওয়া হইয়াছে সেই ঐক্য তো ছিল মুষ্টিমেয় লোকের যাহারা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। জনসাধারণের সুবিধাঅসুবিধার কথা চিন্তা করেন নাই। ঐ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেও অধিকাংশেরই শিক্ষাদীক্ষা তো ছিল বৃটিশ প্রভুদের সেবার জন্য! গান্ধীজীর নিকট রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইয়াছিল অজ্ঞ, অবহেলিত এবং শতধাবিভক্ত জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা এবং উহার সমাধানই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি।

যদিও রাষ্ট্রভাষার নাম হিন্দী এবং উহার মৌলিক রূপও হিন্দী তাহা হইলেও ইহার গঠন গুণীর পরিবর্তন হইতে থাকিবে। এমন হইবে যে হিন্দীভাষী প্রদেশ সমূহের বর্তমান হিন্দী আর থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় হিন্দী ও প্রাদেশিক হিন্দী পৃথক হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই রাষ্ট্রভাষার উপর আপন আপন ছাপ ফেলিতে থাকিবে। এই ভাবেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার জাতীয় জীবনে পূর্ণ বিকাশের যোগ্যতা অর্জিত হইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সমস্যাটি বিচার না করিয়া শুধুমাত্র নেতীবাদী মনোভাব অনুসরণ করিলে আমরা (বাঙ্গালীরা) পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গত ১১ই জুলাইয়ের পি, টি, আইএর খবরে প্রকাশ পাইয়াছে যে লেনিনগ্রাডে রাষ্ট্রপতি আকির হোসেনের বিপুল সম্বর্ধনার শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিকে ভারত, সোভিয়েৎ রাশিয়া ও সোভিয়েৎ সঙ্ঘের পতাকা

দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং হিন্দী ও রুশ ভাষার উচ্চস্বর অক্ষরে স্বাগতবাণী লেখা হয়।

রুশিয়া ভারতের মত বিপুল ও জনবহুল। সেখানকার ভাষার সংখ্যা ভারতের মতই জটিল। উহার শিক্ষাব্যবস্থায় ১৮০টি ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করা সকল ছাত্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। ইহার ফল বিস্ময়কর হইয়াছে: ইংরেজী বা বিদেশী ভাষার সাহায্য না লইয়া রুশিয়ার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পঁচিশ বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশে এই উন্নতি সম্ভব হয় নাই।

মোটের উপর, আমরা কোন দিনই আমাদের ভাষাকে স্বাধীন জাতির ভাষার মত যথোচিত স্থান ও সম্মান দিতে পারিব না, যতদিন ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের দাসসুলভ অত্যধিক অনুরাগ থাকিবে। পরাধীনতার পরিণামস্বরূপ, অব্যবহারের জন্য আমাদের ভাষার যথাযোগ্য উন্নতি হয় নাই। তাহার জন্য আমাদের ভাষাগুলি দায়ী নয়। এইরূপ ঘটার কারণ হইল এই যে কতকগুলি ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং আমাদের ভাষাগুলির পক্ষে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলতঃ আমাদের ভাষা সেই সব ক্ষেত্রে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। লোকের ব্যবহারেই ভাষার শক্তি। কোন জাতিই আত্মশক্তি ভিন্ন সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না।

অবিস্মরণীয় ঘটনা—১৫

রাধিকামোহন লাহিড়ী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমি যখন ফরিদপুর জেলায় (অধুনা পূর্ব-পাকিস্তান) কৃষি কর্মচারী ছিলাম তখন রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুরের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়; এটা প্রায় ৪৭।৪৮ বৎসর আগেকার কথা। তখন রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার পৈতৃক গ্রামের কোরকদির পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। কোরকদি ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, গোয়ালন্দ মহকুমার অবস্থিত, ফরিদপুর সহর হইতে প্রায় ২৩।২৪ মাইল। তরিয়াছিলাম রাধিকাবাবু বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক ও তার বিভাগে ৩০৲ টাকা মাহিনায় চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাজে দক্ষতার জন্য প্রথম ভারতীয় Deputy Director General of Posts and Telegraphs পদে উন্নীত হন, এবং এই পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। আরও জানিতাম তিনি তখনকার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং দেশ নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর এক পুত্রের সঙ্গে তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হয় এবং তাঁহার এক পুত্রের সহিত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর এক কন্যার বিবাহ হয়। সুতরাং ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন তিনি অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আইন ব্যবসায়ে ও একজন প্রধান ছিলেন, ধনে মানেও তাঁহার সমকক্ষ খুব

কর্মই ছিলেন। আমার বেশ মনে আছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে ১৯০৫-৬ সালে কলিকাতার বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ীর বিরাট প্রাঙ্গণে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তিনি বক্তৃতা ইংরেজীতে দিয়াছিলেন; মনে হইতেছে কোন ইংরাজী সংবাদ পত্র বক্তৃতার বিবরণ দিবার সময় লিখিয়াছিলেন, মনে হইতেছিল আমরা যেন ইংল্যাণ্ডের হাইড পার্কে বক্তৃতা শুনিতেছিলাম।

এইরূপ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও রাধিকা বাবু গ্রামে আসিলেন গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নের প্রথম কাজ কৃষির উন্নতি; সুতরাং তিনি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তখন তিনি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন, এবং প্রত্যেক মাসেই জেলা বোর্ডের সভাতে আসিতেন। আমার সহিত প্রথম পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় এবং তিনি যখন প্রত্যেক মাসে জেলা বোর্ডের সভায় যোগদান করিবার জন্য ফরিদপুর সহরে আসিতেন তখন আমার বাড়ীতেই অবস্থান করিতেন এবং প্রায় সব সময়েই গ্রামের উন্নতি, কৃষির উন্নতি কি ভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন। জানি না কেন আমার অনেক পরিকল্পনা সমর্থন করিতেন এবং উহাদের কার্যকর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ও প্রীতির কথা; ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি। একবার চাকায় (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) বিরাট কৃষি সম্মেলন হইতেছে, বাংলার গভর্ণর পৌরহিত্য করিতেছেন। সম্মেলনে কৃষি বিভাগের তদানীন্তন ইংরেজ আধিকারিক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীও উপস্থিত আছেন। রাধিকাবাবু কৃষি বিভাগের কঠোর সমালোচনা করিলেন। তখন লাটসাহেব তাঁহাকে তাঁহার নিজের জেলার অর্থাৎ ফরিদপুর জেলার কথা বলিতে বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমার জেলার কৃষি কর্মচারী সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি তিনি ডাকিলেই আমার গ্রামে যান, কৃষকদিগের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন এবং চিঠি লিখিলেই উত্তর দেন। অথচ কৃষি বিভাগের উচ্চ স্তরের কর্মচারীদিগকে চিঠি লিখিয়া বার বার স্মারক (reminder) দিয়াও উত্তর পাওয়া যায় না; এই কথা বলিয়া যাঁহাদের নিকট চিঠি লিখিয়া ও স্মারক দিয়া উত্তর পান নাই তাঁহাদের নামও বলিলেন। কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এখনও বিদ্যমান আছে, সুতরাং ইহাকে কৃষি বিভাগের legacy বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

অনেক বিষয়েই রাধিকাবাবুর বিশেষত্ব ছিল। ২।১টি উদাহরণ দিতেছি। আমি কৃষি বিভাগে চাকরির প্রথম হইতেই বলিতাম, 'Eat what you grow' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন কর তাহাই খাও; ইহা আমার কথার কথা মাত্র, এই 'শ্লোগান' আমি নিজেও গ্রহণ করি নাই, আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু রাধিকা বাবু ইহার অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যখনি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম তখনি তাঁহার নিজ ক্ষেতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য হইতে প্রস্তুত খাদ্যাদি খাইতে দিতেন। একবার আমার সঙ্গে কৃষি বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি ডিরেক্টার মিষ্টার কেনেথ ম্যাকলিন্ কোরক-দিতে তাঁহার ক্ষেত খামার দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি 'Eat what you grow'-র ব্যতিক্রম করেন নাই। বলা বাহুল্য, মিষ্টার ম্যাকলিন্ ইহাতে খুবই প্রীত হইয়াছিলেন।

আমার প্রতি রাধিকা বাবুর প্রীতি, স্নেহ ও অনুরাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৯২২ সালে

"ফুলের ফসল" শীর্ষক একটি পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম, উহাতে ৪টি গল্প ছিল এবং উক্ত ৪টি গল্পের মাধ্যমে সমবায় ও উন্নত কৃষির প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে রাধিকা বাবু একটি দীর্ঘ প্রশংসাসূচক মন্তব্য ভারতী মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ইহার দুইটি গল্প "ফুলের ফসল" ও "সোনার মেডেল" গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ছায়াচিত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং প্রচার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক জেলার নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রাধিকাবাবুর মধ্যে রসিকতাও ছিল প্রচুর; মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিতেন যাহা শুনিলে হাসি সম্বরণ করা যাইত না। একবার মধুপুরে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন, আমিও সেই সময় সেখানে ছিলাম, তিনি প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, আমিও তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। একদিন অপরাহ্ণে বেড়াইবার সময় তিনি অনেক বাড়ীর নাম, যেমন 'শান্তি কুটীর' 'শান্তিনিবাস' 'শান্ত শ্রী' ইত্যাদি, দেখিয়া বলিলেন, "এইসব বাড়ীর আসল নাম দেওয়া হয় নি, প্রত্যেক বাড়ীর নামের আগে একটি 'অ' অক্ষর যোগ করা উচিত ছিল", আমি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার মানে?" তিনি উত্তর দিলেন, "এই সব বাড়ীতেই অশান্তির স্রোত বহিতেছে, বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে কাহারও মনে শান্তি নাই।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "আমি কখনও যদি বাড়ী করি তাহার নাম দিব 'ঘুঘুর বাসা'। তাহা হইলেই বাড়ীর আসল নাম দেওয়া হইবে।"

যেমন কৃষির উন্নয়নের প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল, শিল্প উন্নয়নের প্রতি তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। শুনিয়াছি তিনি শেষ বয়সে একটি কাগজের কল খুলিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই সর্ব্বস্বান্ত হন।

শুনিলে অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করিবেন না বার্দ্ধক্যে তিনি তাঁহার গ্রামে (কোরকদিতে) বাস করিতেন এবং দিনের পর দিন এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া একটা জলাশয় হইতে বন কচুরিপানা পরিষ্কার করিতেন, কাহারও নিষেধ শুনিতেন না। ইহার ফলে তিনি রোগাক্রান্ত হ'ন এবং সেই রোগেই কোরকদিতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি অতিশয় পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজনও সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর কথা আগেই বলিয়াছি, অমলমোহন লাহিড়ী, জেলা জজ, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জে. এম. লাহিড়ী, পশু চিকিৎসা বিভাগের আধিকারিক, শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী, পশ্চিম বাংলার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতির নাম করিতে পারি। শেষোক্ত দুইজন এখনও জীবিত, কলিকাতায় বাস করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, উকিলের নামও করিতেছি।

অবসর গ্রহণের পর রাধিকাবাবুও কলিকাতার ঐশ্বর্য্যে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন যাপনের জন্য তাঁহার গ্রামকেই বাছিয়া লইলেন এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে কি?

আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও অনুরাগ আমার জীবনের অন্যতম অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি রাধিকামোহন লাহিড়ীর স্ত্রী জীবিতা নাই। তাঁহার কন্যা (ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্রবধূ) মধ্যম গ্রামে (২৪ পরগণায়) আছেন এবং তাঁহার প্রথম পুত্রবধূ (ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা) কলিকাতায় আছেন, তাঁহার পৌত্রগণ বিভিন্ন স্থানে কাজ করিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রবধূ (দ্বিতীয় পুত্র ৺যোহিনী লাহিড়ীর স্ত্রী) মধ্যমগ্রামে বাস করিতেছেন।

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে উপাচার্য নিয়োগ এই প্রথম। ইতিপূর্বে অবশ্য অন্তত আরও দুজন অধ্যাপক উপাচার্য হয়েছিলেন—স্যার যদুনাথ সরকার এবং আর্কুহার্ট সাহেব। ওঁরা অবশ্য কেউই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন না। যাই হোক ডক্টর সেন আজীবন শিক্ষাব্রতী এবং বস্তুতঃ কলকাতার মানুষ। তিনি কলকাতাকে বিশেষ করে জানেন। কলকাতার সোসিও ইকনমিক সার্ভের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি কলকাতার নাড়ীর খবর পেয়েছেন,—কলকাতার প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অতএব এখানকার ছাত্র অসন্তোষ পরীক্ষা ভণ্ডুল প্রভৃতি শিক্ষা জগতের বর্তমান দুর্নৈবের তিনি মোকাবিলা করতে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যায়। কি হবে জানি না, তবে তিনি সমস্যা এড়িয়ে যে চলবে না এ কথা জোর করেই বলা চলে। তিনি নিয়ম শৃঙ্খলাকে মধুময় করে তুলবার প্রয়োজন স্বীকার করে থাকেন। এর দ্বারা ছাত্র চিত্ত জয় করা সম্ভব। আর সেটা পারলে ছাত্রদের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবেই। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা তিনি সম্যকরূপে অবগত বলে শিক্ষার মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার সমীকরণের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে বলেই সকলে আশা করেন।

ডক্টর সেনের জন্ম ১৯০১ সালে। খুলনা জেলার পয়গ্রামে তার বাড়ি। সেখানকার স্কুলতলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সনে ইংরেজিতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম স্থান অধিকার করে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই, এস-সি পাস করার পর বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এলেন। এখান থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি. এ এবং ঐ বিষয়ে এম. এ পাস করলেন। দুটো পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

পাস করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য সময়ের জন্য অধ্যাপনা করেন। পরে আশুতোষ কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এখানে একটানা এগার বছর অধ্যাপনা করে ১৯৪৭ সনে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির লেকচারার হয়ে ফিরে আসেন। ক্রমে ক্রমে প্রফেসর এবং শেষে বিভাগীয় প্রধান (Head of the Department of Economics) হলেন।

এর মধ্যে, পূর্বেই বলা হয়েছে, কলকাতার অর্থনীতি ও সামাজিক সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে সব মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করেন তা থেকে বাঙালী জীবনের দুর্ভাগ্যের মূল সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ জানা থাকলে প্রতিকারের উপায় পেতে সার্থক চেষ্টা করা সম্ভব। তাঁর ডক্টরেটের বিষয় ছিল—Central Banking in under developed money market. এই বিষয়ে গবেষণা করে তিনি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ থেকে Ph. D উপাধি পেয়েছেন। Central Bank এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের গঠন যন্ত্রের কেন্দ্র বিন্দু। অতএব এ বিষয়ে সম্যক ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদিক থেকেও ডক্টর সেন অন্যতম পথিকৃৎ।

Visiting Professor-রূপে তিনি আমেরিকার প্রিন্সটন ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দুটোয়ের সঙ্গে ভ্রমণ করে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তিনি বিবিধ কাজে জড়িয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহকারী সভাপতিসহ কয়েকটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর নিবিড় যোগ রয়েছে। তাঁর কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও আছে। —ক. দ.

সংবাদ

গোপালচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি-সমিতি

(দৌলতপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা গঠিত)

৩৩৮, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৩১

সবিনয় নিবেদন

আমরা, দৌলতপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, ১৯৬৬ সনের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় মিলিত হইয়া স্থির করি যে, গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ আমরা আপাততঃ নিম্নলিখিত তিনটি কর্ম সম্পাদন করিতে উদ্যোগী হইব।

(ক) দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদানের জন্য একটি অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন,

(খ) গোপালচন্দ্রের জীবনী ও কর্মের উপর একখানি পুস্তক প্রকাশ,

(গ) গোপালচন্দ্র স্মরণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ দ্বারা শিক্ষা-বিষয়ক বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের জন্য তথ্যাদি ও রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। গোপালচন্দ্রের জন্মভূমি এবং দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র মহেশ্বরপাশা ও দৌলতপুরের সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া সেই সকল তথ্যাদি সম্পূর্ণ হইতেছে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া গোপালচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধাদি, দৌলতপুর মহেশ্বরপাশার বিবরণ প্রভৃতি যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

গোপালচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে দৌলতপুর কলেজের প্রাক্তন তথা প্রবাসী ছাত্রদের এবং এমনকি সমাজের সর্বস্তরের সকলের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে আমরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছি। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্য গোপালচন্দ্র সম্পর্কে যাহারা উৎসাহী এমন বহুজনের খোঁজ-খবর আমাদের জানা নাই। আপনি আপনার জানা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমাদের আবেদন তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিন, তাঁহাদের ঠিকানা আমাদের নিকট পাঠান।

আর, আপনার সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করুন। আপনার সাহায্য উপরের ঠিকানায় অথবা আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৯ পাঠাইতে পারেন।

গোপালচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি-
সমিতির পক্ষে

ডাঃ অমর সেনগুপ্ত
সভ্যেন সেনগুপ্ত
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
মোহনলাল মিত্র আহ্বায়ক
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, কোষাধ্যক্ষ
কানাইলাল দত্ত
এ্যাড হক্ কমিটির সদস্যবৃন্দ

Siksha

Regd. 02826

শিক্ষায়

পুস্তক-পুস্তিকার

19 NOV 1968

বিজ্ঞাপন প্রকাশ

লাভজনক

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাগণ
সুবিধাজনক চুক্তি করিতে পারেন

শিক্ষার নূতন ঠিকানা

শিক্ষার পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এখন হইতে টাকা-কড়ি, পত্রাদি ও চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করেন।

শ্রীশান্তিরঞ্জন [illegible] পরিচালক,
শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ [illegible] মার্কেট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্তৃক পক্ষি প্রেস [illegible], ৬৮বি বোস [illegible] কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
শ্রীসন্তোষকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত : কার্যালয় : সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২